তৃণখণ্ড

"বনফুল"

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৪৭, অগ্রহায়ণ ১৩৫২

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২০. ১১. ৫২

শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম. বি.,
শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায়, এম. বি.,

শ্রীচরণেষু

যাঁহারা নিজেরা "তৃণখণ্ড" হইয়াও এই 'তৃণখণ্ড'কে সংসার-সমুদ্রে ভাসমান করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতেছি।

বলাই

"তারপর তুমি আবছা দেখিবে, দাঁড়ায়ে নদীর পাড়ে,
জলের তাড়নে একগাছি খড় দূরে চ'লে যায় ভেসে,
ভেসে চ'লে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে ;
বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে—
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।"

—সজনীকান্ত

কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। হাঁ, জ্বর বইকি। তাহাকে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি। অন্যায়, তবু লিখিলাম। সে অপরের বাগ্‌দত্তা জানিয়াও আমার কাব্য-প্রেরণা কিছুমাত্র কমিতেছে না। জ্বরে প্রলাপ বকিতেছি।

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি ক'রে প্রকাশ করিব বল না—কিছু না জানি,
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি ক'রে সাগর-জলের জ্বালার বাণী ?
ঘরের কোণেতে বসিয়া যখন হারায় দিশা,
দিবসে যখন ঘনাইয়া আসে আঁধার নিশা,
হিমানীর বুকে জাগে হায় যবে অনল-তৃষা,
ভাষাও তখন নীরব হয় যে অবাক মানি।

ভাষায় কখনো সে কথা জীবনে যাবে না বলা,
তবু কি বোঝ নি ? বুঝিতে এখনও আছে কি বাকি ?
গভীর রাতের গহন আঁধারে, হে চঞ্চলা,
আমার প্রাণের প্রবল পরশ পাইলে না কি ?

তোমারি লাগিয়া একাকী জাগিয়া যে আকুলতা,
মদির মধুর নিবিড় নিথর যে নীরবতা,
গোপনে ও মনে কহে নি কি কোন নিগূঢ় কথা—
আঁখিতে তোমার দেয় নি কি কোন আবেশ আঁকি ?

আমারে স্মরিয়া শিহরি কখনো ওঠে নি তনু ?
স্বপনে কভু কি লুকায়ে তোমারে দিই নি দেখা ?
তোমার মনের মেঘেতে আঁকে না ইন্দ্রধনু—
আমার মনের তপ্ত তপন-কিরণ-রেখা ?
তোমারে ঘিরিয়া যত ফুল ফোটে আমার মনে,
সুরভি তাহার পাও নাকি তুমি সঙ্গোপনে ?
তোমার লাগিয়া যে কবিতা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
ছন্দ কি তার আজিও তোমার হয় নি শেখা ?

মনে হয় যেন আমার লাগিয়া উতলা প্রিয়া,
গাহ মনে মনে, "আমারি যে তুমি—নহ তো কারো" ;
বুকের বেদনা ঢেকেছ মুখের হাসিটি দিয়া,
আমারে ভুলিতে যত চাও তত ভুলিতে নারো।
আমারি মতন তোমারি মুখেতে ছলনাবাণী—
মনের ভিতর ঘনায়ে তুলেছে বেদনাখানি,
যতই আমারে সরাও দূরেতে আঘাত হানি,
মনের নিভৃতে ততই চাহিছ নিকটে আরো।

প্রেমেই পড়িয়াছি। অন্ধকার বন্ধ ঘরের জানালার ফুটা দিয়া কিরণ-রেখা প্রবেশ করিয়াছে। বন্ধ ঘরে আলোকস্বপ্ন।

সেই আলোক-রেখায় শত শত ধূলিকণার উন্মাদ আবর্ত্তন, বাসনার কলুষ। তবু তাহা আলো। শরাহত পশুর ন্যায় অন্ধকার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছি। মৃত্যুর।

ডাক্তারবাবু!

চমকাইয়া উঠিলাম।—কে? ভেতরে আসুন।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, একটু কষ্ট দিতে এলাম। দেখুন ডাক্তারবাবু, কয়েক দিন থেকে আমার স্ত্রীর কেমন মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। পাশের বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে এই ব্যাপার মশাই।

কি রকম?

বেশ ভাল মানুষ—যাত্রা শুনতে গেল। রাত এগারোটা নাগাদ ফিরে এল—একটি বদ্ধ উন্মাদ। এসেই বললে, আমার নন্দদুলালা? কই, আমার নন্দদুলালা?—ব'লেই গান। সেই থেকে মশাই এক-নাগাড়ে চলছে। আর তো পেরে উঠছি না। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।

কোথায় আছেন তিনি?

বাইরে গাড়িতে ব'সে আছেন। আনব?

আসুন।

আসিলেন একটি যুবতী। আলুলায়িত কেশ, অবিন্যস্ত বেশবাস, চোখে উদাস দৃষ্টি। আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি ডাকছেন আমায়?

বলিলাম, হ্যাঁ, বসুন ওইখানে।

নিকটস্থ চেয়ারটায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেন ডেকেছেন আমায়—বলুন না?

আপনার কি হয়েছে? এমন করছেন কেন?

খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, কই, কিছু হয় নি তো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আপনার স্বামী যে বলছেন, আপনি বাড়িতে মহা উৎপাত আরম্ভ করেছেন। নন্দদুলাল কে?

নন্দদুলালের গান শুনবেন? শোনেন নি আপনি?—বলিয়াই—

কোথায় আমার নন্দদুলাল
কোথা রে তুই ননীচোরা?—

হঠাৎ আবার গান বন্ধ হইয়া গেল।

আসবে খোকা আমার কাছে? এস।

ফিরিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ির হরিশবাবুর ছোট খোকাটিকে কোলে করিয়া ঝি দাঁড়াইয়া আছে। খোকাটির

তিন দিন হইতে জ্বর, আমাকে রোজ দেখাইতে লইয়া আসে।

এস না, কেমন পুতুল দোব তোমাকে। এস আমার কাছে। আসবি না—তবে রে দুষ্টু—

বলিয়া উন্মাদিনী হঠাৎ উঠিয়া ছোঁ মারিয়া খোকাকে কাড়িয়া লইয়া প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল। খোকা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, ঝি হৈ-রৈ তুলিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে উদ্ধার করিলাম। তরুণীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, আমার কাছে কোন খোকাই আসে না। কেউ আসে না। কেন, বলুন না ?

রমণীটির পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলাম। তাহার পর স্বামীটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করা প্রয়োজন বুঝিলাম।

কতদিন পূর্ব্বে আপনার 'গনোরিয়া' হয়েছিল।

লোকটা থতমত খাইল, কিন্তু সত্য কথাই বলিল, দশ বছর আগে ; তখন আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।

ছেলেপিলে হয় নি ?

একটি হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, আর হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে কালো কালো দাগ দেখলাম—চাবুকের দাগের মত। মেরেছেন নাকি ?

ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হ্যাঁ, দু-চার ঘা দিয়েছিলাম একদিন। বন্ধু-বান্ধবেরা সব বললেন কিনা যে, ওসব ন্যাকামির একমাত্র ওষুধ প্রহার। তাই একটু, এমন বেশি কিছু নয়—অর্থাৎ—

আচ্ছা, আর মারধোর করবেন না। এখন শুনুন। আপনার স্ত্রীর ছেলেপিলে না হ'লে অসুখ সারবে না; ছেলেপিলেও যে হবে, তারও সম্ভাবনা অল্প। তবু চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। আপনার নাম কি?

পাঁচুগোপাল বসাক।

ব্যবস্থাপত্র দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে না করিতেই প্রতিবেশী হরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত।

কি হয়েছিল মশাই? একটা পাগলী নাকি খোকাকে গলা টিপে ধরেছিল?

তাঁহাকে সব বুঝাইয়া বলিলাম।

তিনি বলিলেন, যাক, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আপনি একবার ছেলেটাকে দেখে যাবেন। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

আচ্ছা। গ্লুকোজটা খাওয়াচ্ছেন তো?

ওটা এখনও কেনাই হয় নি, না হয় আজ কিনেই আনি,—বুঝতেই তো পারছেন ডাক্তারবাবু, এই অল্প মাইনেতে সাত-আটটি ছেলেপিলে নিয়ে—তবু আপনাদের পাঁচজনের দয়া

আছে ব'লে টিকে আছি। আপনি একবার দয়া ক'রে দেখে যাবেন। আনছি আজই গ্লুকোজ।

আচ্ছা।

হরিশবাবু চলিয়া গেলেন। গরিব মানুষ, কাচ্চাবাচ্চা লইয়া বিব্রত। অথচ সেদিন পর্য্যন্ত Viriligen ইন্‌জেক্‌শন লইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিয়াছেন। আশ্চর্য্য মানুষের মন! আমার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখি, আর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।

ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত গোঁড়া ছিলাম। আমার স্টোভে একটি ছেলে মুর্গীর ডিম সিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া স্টোভ ফেলিয়া দিই। আজ তো মুর্গীর মাংস না হইলে চলেই না। এমন কি গোমাংসেও আপত্তি নাই। মানুষের অহরহ বিবর্ত্তন! আজকের আমি, দশ বৎসর কেন, কয়েক মাস পরেই আর একজন লোক হইয়া যাইব। স্কুল, কলেজ, ধর্ম্ম, হিতোপদেশ, সকলে সমস্বরে শিখাইল—পরস্ত্রী জননীবৎ। অথচ সেই পরস্ত্রীর প্রেমেই তো পড়িয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বেও কি ইহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? ছিল না। আপনারা হাসিতেছেন তো? হাসিবেন না। পরস্ত্রী নয়। তবে স্ত্রী বটে। আমার সমস্ত সত্তাকে সে পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজমান, অথচ— যাক, বর্ণনা করিব না। আমি ডাক্তার, আমি কবিও। আমার জীবন-কাহিনী যদি শুনিতে চান, তবে আমার কবিতাও পড়িতে হইবে। তাহাই আমার জীবনের সত্য প্রকাশ।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন

২

চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। নদীর উপর নৌকায় চলিয়াছি। দূর গ্রামে কোন গৃহস্থ তাঁহার একমাত্র পুত্রের অসুখে বিপন্ন। সুতরাং আমাকেও খানিকটা বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

নিবিড় অন্ধকারে নদীর ভাষা শুনিতেছি। বেগবতী তরঙ্গিণীর ভাষা—চলন্ত স্রোতের কলকল-ধ্বনি। ধীরে ধীরে সে আমার কাছে আসিয়া বসিল। কোন কথা নাই। নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, স্রোত কথা কহিতেছে, সময় বহিয়া চলিয়াছে। শতাব্দী পার হইয়া গেল, তাহার স্পর্শ যেন অনুভব করিতেছি। সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ। মনের কানায় কানায় কান্না জমিয়া উঠিতেছে। এই যে মধুর বেদনাময় অনুভূতি, ইহার ভাষা কোথায়? ছন্দে ছন্দে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে—

অন্ধকারে আঁখি মুদি দেখিতেছি তাহার স্বরূপ,
নাহি কোন ছদ্মবেশ আর;
নয়ন-সম্মুখে তার সত্যমূর্ত্তি জাগে অপরূপ,
আলো তারে দিল অন্ধকার।

দিবসের আলো যেন আড়াল করিয়াছিল তারে,
ছলনায়, লোক-ভয়ে, ছোট বড় শত মিথ্যাচারে;
আবরিয়া রেখেছিল আপনার নিগূঢ় আত্মারে,
স্পর্শ যেন পাইতেছি তার।
দিবসে বলেছে যাহা চুপিচুপি এসে অন্ধকারে,
করিতেছে তাহা অস্বীকার।

তাহার সেই অস্বীকারের ভাষা শুনিতেছি। সে যেন বলিতেছে, দিবালোকে আমি তো তোমার কেহ নই। আমি তখন পৃথিবীর, আমি সমাজের। কিন্তু এ গভীর গহন অন্ধকার রাত্রে—

ওগো তুমি বল কে গো—ওগো মোর অন্তর-শায়িতা,
বৃথা কেন কাল নষ্ট কর,
দিবসের তীব্রালোকে অনায়াসে রহি লুক্কায়িতা
অন্ধকারে হও স্পষ্টতর।

তাহার নিশ্বাসের স্পর্শ যেন গায়ে লাগিতেছে। তাহার চুল আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল।

আকাশ-কুসুম যাহা দিবসের সুতীব্র আলোকে,
অন্ধকারে তারি মালা গাঁথি আমি স্বপ্নাতুর চোখে;
সুনিবিড় তমিস্রায় ধরা দাও, বুঝিবে না লোকে
অপরূপ কি যে মূর্ত্তি ধর।
দিবসে হারায়ে ফেলি, খুঁজে ফিরি বাণীহীন শোকে—
আপনারে কোথায় সংহর।

অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র—অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়া জ্বলিতেছে। অন্ধকার যেন বলিতেছে, আমাকে উপেক্ষা করিও না, আমি আছি বলিয়াই তোমরা জ্বলিতেছ ; দিবসে তোমরা কোথায় থাক ? আমার নিবিড়তায় তোমাদের প্রকাশ।

"তুমি মিথ্যা, তুমি মোহ"—দিবসের এ তীব্র-ভাষণ
বিজ্ঞানের নানা যুক্তি বহে,
অন্ধকারে ভেসে যায় বিজ্ঞতার সকল শাসন,
অন্ধকার কহে, নহে নহে।
অন্ধকারে প্রিয়া সে যে মোর লাগি আকুলা উন্মনা,
বাহুভরা আলিঙ্গনে, উন্মাদিনী, অজস্র-চুম্বনা,
অলস রভস-ভরে শ্রুতিমূলে প্রণয়-গুঞ্জনা,
অকারণে কত কি যে কহে !
আবার দিবস আসে—মিলাইয়া যায় সে মূর্চ্ছনা,
আঁধার প্রতীক্ষা করি রহে।

সমস্ত অন্তর ভরিয়া হে অন্ধকার, তোমাকে নমস্কার করি। হে নক্ষত্র প্রকাশক, হে অনন্ত, অখণ্ড, তোমায় প্রণাম করি। স্বপ্ন-সাগরের নাবিক তুমি, অসম্ভবকে সম্ভব কর, সুদূরকে নিকটে আন, অন্তরকে বাহিরে লইয়া যাও। তুমি মহৎ, তুমি স্নিগ্ধ, তুমি নীরব। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর। কিন্তু একটু পরে তো আর তুমি থাকিবে না। আলোকের রথ-ঘর্ঘরধ্বনি যে শোনা যাইতেছে। সেই মুখর,

সেই স্পষ্ট, সত্যবাদী কর্ম্মী, সে তো আসিল বলিয়া। তখন তুমি কোথায় আত্মগোপন কর? তখন তোমার এ স্নিগ্ধ কান্তি কোথায় লুকাইয়া রাখ? তাহার নিশ্বাসের বেগ বাড়িতেছে। তাহার আলিঙ্গন যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। আলুলায়িত কেশবাস সম্বরণ করিয়া সে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল। "আর একটু থাক।" তাহার তনুর গন্ধে আমার স্বপ্ন মদির। সে চলিয়া গেল।

কেবা সত্য, কেবা মিথ্যা—কে বলিয়া দিবে মোরে কহ,
দিবস, না গভীর আঁধার?
যুক্তি কভু মুক্তি দেয়? চিত্ত মোর ভাবে অহরহ,
উদ্বেলিছে প্রশ্নের পাথার।
সে পাথারে একখানি ভাসিতেছে দুঃসাহসী তরী,
তোমারে পাওয়ার আশা দুলিতেছে শিহরি শিহরি,
এ জীবনে হাসিয়াছি বহুদিন মন-প্রাণ ভরি,
বাকি আছে এখনো কাঁদার—
অসম্ভব সাধনায় পূর্ণ করি দিবা-বিভাবরী
বাকি আছে দুঃসাধ্য সাধার।

বাবু, একটু উঠতে হবে।—মাঝি আসিয়া বলিল।

কেন?

একটা মড়া এসে নৌকোটাতে ঠেকেছে।

উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। মড়াই বটে—একটা স্ত্রী-লোকের। চুলগুলা ভাসিতেছে। ঠোঁট এবং গালের খানিকটায় মাংস নাই। বীভৎস হাসি হাসিতেছে।

যাঁহাদের বাড়ি যাইতেছিলাম, তাঁহারা লোকজন লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া ঘাটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি নামিবামাত্রই রোগীর পিতা নয়নবাবু আসিয়া আমার তুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, একটু পা চালিয়ে যেতে হবে ডাক্তারবাবু, বড় বেশি বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে সন্ধ্যে থেকে।

পা চালাইয়া চলিলাম।

কদিন থেকে অসুখ?

আজ আট দিন।

ইতিপূর্ব্বে কে দেখছিলেন?

অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আমাদের ধাতে সয় না ব'লে হোমিওপ্যাথি করছিলাম, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি দেখে আজ আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

ও।

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রোগীর ঘরে গেলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—ডবল নিউমোনিয়া। অবস্থা খুব সঙ্গিন। রাত কাটিবে না। রোগী প্রলাপ বকিতেছে—

কচাকচ কেটে ফেলছে—দেখতে পাচ্ছ না তুমি? উঃ,

কত রক্ত! আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে, ওই আর একটা মুণ্ডু পড়ল, থানায় খবর দেওয়া চাই—চল চল—আঃ—

বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ পিতাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তা হ'লে আজ রাতটা আপনি থেকে যান ডাক্তারবাবু, আপনার ফীস্ যা লাগে, তা আমি দোব। আমি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমার থাকা বৃথা, ততই তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে থাকিতে হইল। তখন তাঁহাদের বলিলাম, তা হ'লে এক কাজ করুন। আজ সমস্ত রাত ওঁর কাছে একজনের থাকা দরকার। আপনারা পালা ক'রে সেটা করুন। আমি পাশের ঘরেই কোথাও থাকব, মাঝে মাঝে দেখে যাব। কজন আছেন আপনারা?

আমি, মহিন্দর, বউমা আর আমার স্ত্রী। গোড়ার দিকটায় না হয় বউমাই থাকুন। আমার স্ত্রীর আবার যা মাথা ধরেছে, সেখানে আবার একজনের থাকা দরকার। তাঁকেও একবারটি দেখুন না হয়। গেরো কি এক রকম ডাক্তারবাবু?

দেখিলাম তাঁহার স্ত্রীকে। ষোড়শী যুবতী। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরা সাধারণত যাহা হইয়া থাকেন তাহাই। মাথাধরার যে ঔষধই দিই না কেন, সারিবে না। এক বড়ি অ্যাস্পিরিন খাইয়া ঘুমাইতে বলিয়া বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিতে হইল, উনি বড় কাতর রয়েছেন, আপনি এইখানেই থাকুন। আপনাকে যদি দরকার হয়, খবর দোব এখন।

তখন আসিয়া আসল রোগীর ব্যবস্থাদি করিলাম, ইন্‌জেক্‌শন দিলাম। মাথার শিয়রে দেখি, তাঁহার স্ত্রী বসিয়া জলপটি দিতেছে। মহিন্দর অর্থাৎ ছেলের পিসামহাশয় নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, ডাক্তারবাবু, চলুন এইবার, একটু যা হোক মুখে দেবেন। আপনি চা খান কি?

হ্যাঁ, খাই বইকি।

বাহিরের বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে শুনিলাম, রোগী প্রলাপ বকিয়া চলিয়াছে, ধর ধর—আহাহা—আউট হয়ে গেল—আজকাল নরেনটা কিচ্ছু খেলতে পারে না। এই, একটা বিড়ি দে তো—ওরে—আহাহা—

বাহিরের ঘরে আমি আর মহিন্দর।

মহিন্দর বলিতেছে, হাড়-কেপ্পন মশাই। আমি না এসে পড়লে কি আপনাকে ডাকত নাকি?

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, এসেই বা আর বিশেষ কি করলাম! ওর তো জীবনের কোন আশা দেখি না।

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিসামহাশয় বলিলেন, আহা, তাতে আপনার আর দোষ কি? গোড়া থেকে যদি দেখতেন, তা হ'লেও বা একটা কথা ছিল! হাড়-কেপ্পন

মশাই, চেনেন না আপনি ওকে। আমি আফিংখোর মানুষ, তোর ছেলের অসুখ শুনে দৌড়ে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, এক ফোঁটা দুধ এসে-ইস্তক পেটে পড়ে নি। চামার—চামার।

প্রসঙ্গ ফিরাইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেটি করেন কি?

করবে আবার কি—বি. এ. ফেল ক'রে বিয়ে করেছে, এই মাস-ছয়েক মাত্র হ'ল। ওর ভাবনাই বা কি বলুন—বাপের এক ছেলে, নগদ টাকা, তেজারতি, বিষয়-আশয় যথেষ্ট। তবে অংশীদার জুটতেও পারে। বাপের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পটাপট বিয়েই ক'রে চলেছে। প্রথম বউটা মোলো বেঘোরে, বিনা চিকিৎসায়। দ্বিতীয়টা গেল সর্পাঘাতে, সেও প্রায় বেঘোরে। এইবার এইটেকে ধরেছে—দেখা যাক। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আবার মহিন্দর বলিল, হাড়-কেপ্পন, চামার—চামার। আমি আফিংখোর লোক, এক ফোঁটা দুধ দিতে ওর বুক ফেটে যায়।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার আর একবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, আপনি বসুন একটু, দেখে আসি ও-ঘরে একবার।

হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—দেড়টা।

পাশের ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। শ্বাস উঠিয়াছে। বধূ পাশে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে তখনও পাখাটি ধরা। সমস্ত মুখে গভীর পরিশ্রান্তি। সিঁথির সিঁদুরে আগুন জ্বলিতেছে। তাহাকে আর উঠাইলাম না। ব্যাগ হইতে একটা ইন্‌জেকৃশন বাহির করিয়া দিতে যাইব, এমন সময় সব শেষ হইয়া গেল। মহিন্দরকে খবর দিলাম। সে আসিয়া বলিল, যাক। ওর ছেলে কি কখনও বাঁচে! এখানে ওটা ঢাকা রয়েছে কি?

আমি বলিলাম, দুধ বোধ হয়।

এঁটো না কি?

না, এঁটো নয় বোধ হয়।

তবে আর এটা কেন নষ্ট হয়?—এই বলিয়া মহিন্দর সেই মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইয়া লোভী শিশুর মত ঢকঢক করিয়া দুধটা খাইয়া ফেলিল।

বধূর ঘুম ভাঙিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি জড়সড় হইয়া উঠিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। এখনও বেচারা জানে না!

ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। আমি বাহিরের ঘরে অপরাধীর মত বসিয়া আছি। পিসামশাই আসিয়া ফীসের টাকাটা হাতে দিলেন। বলিলেন, বাজিয়ে নিন মশাই—ও যা চামার, হয়তো সবগুলোই খারাপ দিয়েছে।

আবার নৌকায় চড়িয়া ফিরিতেছি। আকাশে আলো ফুটিতেছে। আমার অন্তরলোক-বাসিনীরও ঘুম ভাঙিল।

সে হাসিয়া আমার পানে চাহিল। আমার মন কিন্তু তখন বিষণ্ণ। সামান্য হাসিলাম মাত্র।

নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নৌকা হইতে নামিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, কাল সন্ধ্যে থেকে আপনার খোঁজ করছি।

ভদ্রলোককে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিতে হইল, আপনি কোথায় থাকেন?

আমি এখানে থাকি না। দু-চার দিনের জন্যে চেঞ্জে এসেছি।

ও।

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকের বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশের উপর, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে তাদৃশ গাম্ভীর্য্য নাই, বরং শৌখিনতাই বেশি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দরকার?

আমাদের বাড়ি একবার যেতে হবে, আমার ভাগ্নেটির তিন-চার দিন থেকে জ্বর হয়েছে। বাড়িতে আর অন্য লোকও কেউ নেই। আপনি একবার যাবেন? ঘোষপাড়ার লাল বাড়িটাতে আছি আমরা।

আচ্ছা, যাব।

ঘোষপাড়ার লাল বাড়িতে গেলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাণকৃষ্ণবাবু, দেখিলাম, দাঁড়াইয়া আছেন। ভিতরে গেলাম, তাঁহার ভাগিনেয়কে দেখিলাম, ব্যবস্থাদিও করিলাম। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একবার লক্ষ্য করিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু জানালা দিয়া পাশের বাড়ির ছাদের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন, এবং তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটি মেয়ে ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, মেয়েটি নির্ব্বিকার, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু মুগ্ধ।

ভাগিনেয়, দেখিলাম, স-জ্বর অবস্থাতে মুচকি মুচকি হাসিতেছে। ব্যাপার কি?

হঠাৎ প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিয়া উঠিলেন, ওঃ!

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল?

না, কিছু নয়। তা আপনাকে বলতে বাধাই বা কি থাকতে পারে? এ এক বিপদ হ'ল দেখছি। চলুন বাইরের ঘরে।

বাহিরের ঘরে গেলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, মশাই, বিপদ কি এক রকম! পাশের বাড়ির ছাদে যে মেয়েটি দেখলেন—দেখেন নি?

হ্যাঁ, দেখলাম বটে একটি মেয়েকে।

ভদ্রলোক তখন আমার কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া অতি চুপিচুপি বলিলেন, মেয়েটি আমার প্রেমে পড়েছে। Hopelessly in love.

বলেন কি! কেমন ক'রে বুঝলেন?

আমি ওঘরে গেলেই ঠিক ছাদে আসবে। মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আমাকে দেখলেই।

কি আর বলিব! একটু হাসিলাম মাত্র।

এমন সময় শ্যামবর্ণ মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, আসুন, সনাতনবাবু, এই যে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। সনাতনবাবুই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। আপনাদের আলাপ-পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।

আলাপ-পরিচয় ছিল না। তবু সনাতনবাবুকে নমস্কার করিলাম।

সনাতনবাবু বলিলেন, কেমন দেখলেন প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগ্নেকে? জ্বরটা কি ব'লে মনে হয়?

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, বিশেষ কিছুই বুঝিলাম না। আন্দাজে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিয়াছি। রোগীর এবং আমার যদি কপাল ভাল হয়, উহাতেই সারিয়া যাইবে।

কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনের কাছে সরল সত্য কথা বলা চলে না, অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। বলিলাম, রেমিটেণ্ট-গোছের মনে হচ্ছে। তবে কুইনিনটা গোড়ায় গোড়ায় একটু দিয়ে রাখা ভাল। দিন-দুয়েক দিয়ে দেখা যাক। সনাতনবাবু দেখিলাম, অত সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার diagnosis কি?

সে তো আর একদিনে চট ক'রে বলা চলে না। রক্তটা পরীক্ষা করলে হয়তো ধরা যেতে পারে।

সনাতনবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন। বলিলেন, আজকাল আপনাদের ওই হয়েছে এক ফ্যাশান। অমুক পরীক্ষা কর, তমুক পরীক্ষা কর! সেকালের সব ডাক্তাররা কিন্তু এসবের ধার ধারতেন না। ছিলেন আমাদের হেমন্ত ডাক্তার। ইত্যাদি অনর্গল বলিয়া গেলেন।

হেমন্ত ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া পেটে টিউমার হইয়াছে বুঝিতে পারিতেন। রমেশ ডাক্তার রোগীর ফোটো দেখিয়া তাহার জ্বর আছে কি না বুঝিতেন। বিশ্বম্ভর ডাক্তার, পতিত কবিরাজ, হরিকিশোর কম্পাউণ্ডার, সকলেই চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমাদের অপেক্ষা বেশি পারদর্শী ছিলেন বুঝিলাম।

হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, এঁদের মতন কি আমরা পারি? আমাদের এর বেশি আর বিদ্যে নেই।

সনাতনবাবু যেন একটু প্রসন্ন হইলেন।

বলিলেন, সেকালের সব ব্যাপারই ছিল আলদা রকমের। খেতে পারতাম কত আমরা! ভরপেট খাওয়ার পর অবলীলাক্রমে দু সের সন্দেশ, দশ-বারোটা ল্যাংড়া আম কতবার খেয়েছি। গোটা পাঁঠা পারেন খেতে একটা?

স্বীকার করিতে হইল, পারি না।

তবে?

ইহার কোন্ সদুত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ

সনাতনবাবু বুকের পেশী ও হাতের গুলি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন, এখনও ব্যাপারখানা দেখুন। দেখিলাম, ভদ্রলোক পেশীবহুল সন্দেহ নাই। সনাতনবাবুর বয়স অন্তত ষাটের কাছাকাছি ; এ বয়সের হিসাবে শরীরে বাঁধন আছে স্বীকার করিতেই হইবে।

আমার একবার নাড়ীটা দেখুন তো।

সনাতনবাবুর নাড়ী দেখিলাম। মনে হইল, যেন high blood pressure ; বলিলাম। শুনিয়া সনাতনবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওটাও একটা আজকালকার ফ্যাশান, হাই ব্লড প্রেশার !

এমন সময় প্রাণকৃষ্ণবাবু আড়ালে লইয়া গিয়া সনাতনবাবুকে কি বলিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার দুইজনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

সনাতনবাবু ছাদটার পানে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তাই নাকি ? আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে, বিচিত্র নয় কিছুই।

বুঝিলাম, প্রাণকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। লোকটা পাগল নাকি ? দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সবে ঘুমটি আসিয়াছে।

রাত্রি কত হইয়াছে বলা শক্ত। হাত-ঘড়িটা বন্ধ।

ডাক্তারবাবু!

ধড়মড় করিয়া উঠিলাম। বাহিরে গিয়া দেখি, লণ্ঠন-হাতে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে।

কি চান?

শিগগির একবার চলুন সনাতনবাবুর বাড়ি।

কেন, কি হ'ল?

তিনি পাইখানা থেকে এসে কেমন করছেন। শুয়ে পড়েছেন।

পদগতিতে যতটা দ্রুত যাওয়া সম্ভব, গেলাম। গিয়া দেখি, সনাতনবাবু আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। শিয়রে বসিয়া স্ত্রী আকুলভাবে বাতাস করিয়া চলিয়াছেন।

সনাতনবাবু, দেখি একবার আপনার হাতটা?

কোন উত্তর নাই।

আবরণ উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, মারা গিয়াছেন।

পেশীবহুল দেহ ঠিকই আছে। প্রাণ নাই।

অ্যাপপ্লেক্সি।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম; একাই।

হঠাৎ একটা অন্ধকার গলির ভিতর হইতে কে ডাকিল, ডাক্তারবাবু নাকি?

কে ?

দেখি, গলি হইতে বাহির হইলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

আপনার টর্চটা একবার দিন তো ডাক্তারবাবু।

কেন, ব্যাপার কি ?

চুপিচুপি প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, এই সন্ধ্যের সময় ওই গলিটার ভেতর—সেই মেয়েটা কাগজের মত কি একটা যেন ফেললে। ঠিক লভ লেটার। দেখিলাম, গলিটা সেই ছাদ ও প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ির ঠিক মাঝখানে। কৌতূহল হইল। টর্চ লইয়া গেলাম গলির ভিতর।

সেখানে নানাবিধ আবর্জ্জনা। তাহার মধ্যে একটা সাদা কাগজের মত কি রহিয়াছে দেখিলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া তাহা লইয়া আসিলেন। কাগজে মোড়া কি একটা যেন!

খুলিয়া দেখা গেল, কতকগুলি চুল।

মেয়েরা প্রসাধন-শেষে মাথার ওঠা-চুলগুলি অনেক সময় কাগজে মুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, তাহাই।

দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

হ্যাঁ, চিঠি কই, ও তো চুল, ফেলে দিন।

বড় বেরসিক লোক আপনি। ইংরেজী নভেলে পড়েন নি আপনি, মেয়েরা তাদের প্রণয়ীকে চুল উপহার দেয় ? এ তাই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, চোখে পাগলের দৃষ্টি।

ঠিক তো, পাগলই।

ঘরে শক্ত ব্যারাম, আর এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাত্রি দ্বিপ্রহরে গলির মধ্যে প্রণয়-নিদর্শন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মনে পড়িল, এই রকম পাগলদের কথা পড়িয়াছিলাম বটে। একজনকে দেখিয়াছিলামও, তাঁহার ধারণা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ গোপনে তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ লইয়া শোধ দিতেছেন না। অন্য সব বিষয়ে ইঁহারা সাধারণ লোকের মতই। কিন্তু একটি কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁহারা পাগল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। ইঁহার ধারণা, মেয়েরা দেখিবামাত্র ইঁহার প্রেমে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাগ্নে কেমন আছে?

চুলগুলি সযত্নে বুকপকেটে রাখিতে রাখিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, সমস্ত দিন ওই বিদ্যেধরীর জ্বালায় কি আর অন্য কিছু করবার অবসর পেয়েছি! বার-পাঁচেক ছাদে এসেছে, জানলাতেও তিনবার উঁকি দিয়েছে। জ্বালাতনে পড়া গেছে।

পাগলের সহিত আর কতক্ষণ বকিব!

বলিলাম, আচ্ছা, বাড়ি যান।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় আবার শুইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবুকে পাগল বলিতেছি, আমি নিজে কি তাই নয়? যাহার হাসি, ছলনা, লজ্জা লইয়া আমি

স্বপ্নের প্রাসাদ রচনা করিয়াছি, সে হয়তো আমাকে মোটেই ভালবাসে না। ওই ছাদের মেয়েটির মতই হয়তো সে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, আমি প্রাণকৃষ্ণবাবুর মত অন্ধকার গলিতে বৃথাই ঘুরিয়া মরিতেছি।

নিবিড় বর্ষা নামিয়াছে।

সকালে উঠিয়া অবধি দেখিতেছি, আকাশে বাতাসে বর্ষার আয়োজন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, আকাশের গুরু গুরু ডাক। উঠানে কদম্বগাছটায় অসংখ্য ফুল। হাতে কোন কাজকর্ম্ম নাই, একটিও রোগীর দেখা নাই। ভজুয়া চাকরটাকে কাল ছুটি দিয়াছি, এখনও পর্য্যন্ত সে আসিল না।

অলসভাবে বিছানায় বসিয়া বর্ষা-সমারোহ দেখিতেছি।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"—মনে পড়িতেছে। আজ আষাঢ় মাসের তেসরা, এবং আরও অনেক অমিল আছে, কিন্তু মিলও যে প্রচুর। বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

আজিকে যদিও সখি, আষাঢ়ের তৃতীয় দিবস,
এবং যদিও নাম মোর
নহে কবি কালিদাস, নহি উজ্জয়িনীবাসী,
তবু আজি এই ঘন ঘোর
সুনিবিড় বরষার সুবিপুল আয়োজন—

ডাক্তারবাবু!

ভেতরে আসুন।

আসিলেন পিওন—হস্তে একটি টেলিগ্রাম।

Come sharp. Nagen seriously ill.

সুতরাং সমস্ত কবিত্বকে শিকায় তুলিয়া নগেনের ব্যাপারে মগ্ন হইতে হইল। আমরা স্বাধীন ব্যবসা করি কিনা! নগেন, জাতিতে বেহারী ব্রাহ্মণ, আমার বন্ধু—বিশিষ্ট বন্ধু।

তথাপি আমাকে ফী দেয়। দুই-এক বার না লইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে আন্তরিক অস্বস্তি বোধ করে। চিরকাল তাহার যুক্তিটা এইরূপ যে, ইহা তোমার ব্যবসায়। আমি তোমার বন্ধু বলিয়াই বিশেষ করিয়া তোমাকে ফী দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ আমি তাহা দিতে এখনও সক্ষম। যখন অক্ষম হইব, তখন না হয় তোমার উপর দাবি করিব। এখন কেন? বলিবার কিছু নাই। নগেন থাকে মতিহারীতে। ট্রেনে করিয়া যাইতে হইবে। তিনবার পথে চেঞ্জ। এই বিপুল বর্ষা! কিন্তু নগেনের অসুখ। যাইতেই হইবে; অন্য কোন উপায় নাই।

মুষলধারা।

স্টেশন অভিমুখে চলিয়াছি। গাড়ির ঘোড়া দুইটি যেন আর টানিতে পারিতেছে না—পথে এত কাদা। গাড়োয়ান ঘোড়ার পৃষ্ঠে অবিরাম চাবুক বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। গতি কিন্তু বাড়িতেছে না, আবার চাবুক।

ওরে, আর মারিস না।

ট্রেনের আর বেশি সময় যে নেই ডাক্তারবাবু।

হ্যাঁ, তা বটে।

ঘড়ি দেখিলাম, ট্রেন ছাড়িতে আর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাকি আছে। পথও প্রায় মাইল-দেড়েক বাকি। টিকিট করিতে হইবে। সুতরাং ঘোড়ার প্রতি সহানুভূতি চলে না। বলিলাম, হাঁকিয়ে চল্‌ তা হ'লে।

আবার চাবুক চলিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া একটা সাঁকো। সাধারণ কাঁচা রাস্তায় যেমন সাঁকো থাকে, সেই রকম। আমার গাড়ি যখন সেই সাঁকোর উপর উঠিল, তখন মনে হইল, যেন একজন লোক পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতে গিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

ওরে, থাম্‌ থাম্‌। দেখ্‌ তো, নীচে কে প'ড়ে গেল যেন। গাড়োয়ান কর্দ্দমাক্ত এক ভদ্রলোককে তুলিয়া আনিল। ঠোঁটের খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত।

প্রাণকৃষ্ণবাবু।

আপনি কোথা যাচ্ছিলেন এই বৃষ্টিতে? আসুন, গাড়ির ভেতরে বসুন। কোথাও যাবেন নাকি?

প্রাণকৃষ্ণবাবু হাঁপাইতেছিলেন। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, এই একবার স্টেশনে যাচ্ছিলাম। সেই মেয়েটি এই ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কিনা। শেষ দেখাটা দিয়ে আসা কর্ত্তব্য নয়?—বলিয়া হাসিতে লাগিলন। ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। হাসি আর রক্ত একাকার হইয়া গেল।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া গাড়িতে বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সেই মুষলধার বৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু সমস্ত প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, প্রতি জানালায় খুঁজিতেছেন। কই, কেহ তো মুখ বাড়াইয়া বসিয়া নাই!

হঠাৎ মেয়েদের গাড়ির কাছে গিয়া হাতলটা ঘুরাইতেই একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহাকে বাধা দিল, ওটা মেয়েদের গাড়ি। স'রে যান, ট্রেন ছাড়ছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, ওষ্ঠ বাহিয়া রক্তধারা পড়িতেছে।

গাড়ি বাহিরের সমস্ত দুর্য্যোগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অগণিত মাঠ-বন-নদী-পর্ব্বত পার হইয়া যাইতেছে। একা একটি কামরায় বসিয়া আছি। প্রাণকৃষ্ণবাবুর কথা ভাবিতেছি। আহা, মানুষ কত অসহায়!

প্রাণকৃষ্ণবাবুর মুখটা বার বার মনে পড়িতেছে।

চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ঝড়ের বেগে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। বসিয়া ভাবিতেছি, সে তো একদিনও বলে নাই

যে, সে আমাকে ভালবাসে। আমি কাছে গেলে সরিয়া গিয়াছে—সাধ্যপক্ষে কাছেই আসে নাই, আমাকে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। আমি যেন একটা ডাকাত। আহা, সত্যই যদি ডাকাত হইতাম! জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া আসিতাম, যেমন অসঙ্কোচে একটা ফুল পট করিয়া ছিঁড়িয়া লই। কিন্তু আমি ভদ্রলোক, আমার মনের বর্ব্বরটাকে মুখোশ পরাইয়া রাখিয়াছি।

ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে পারি না।

পৃথ্বীরাজরা কি মরিয়াছে, সংযুক্তারা কোথায়?

ইচ্ছা করে, চীৎকার করিয়া তাহাকে বলি—

ঝঞ্ঝাসম তব দ্বারে হানা দিতে আজি আসিয়াছি,
অকস্মাৎ প্রাণ ভ'রে অকাতরে ভালবাসিয়াছি,
আপনার আচরণে শতবার কত শাসিয়াছি,
তবু ভাসিয়াছি।
ভাসিয়াছি আজি আমি সীমাহারা মহাপারাবারে—
অতল সে কালো জলে নিঃশেষে নিজেরে হারাবারে।
আপনারে বন্দী রাখি হিসাবের ক্ষুদ্র কারাগারে,
সখী, যারা পারে

নিক্তিতে ওজন করি করিতে প্রণয় নিবেদন,
আমি তাহাদের নহি। মোর নহে ক্ষীণ আবেদন।—
চিরকাল যুগে যুগে গণ্ডি-দেওয়া শান্তি-নিকেতন
করি উচ্ছেদন—

মর্ম্মান্তিক তীব্র দাহ—এ পথের পাথেয় আমার,
তাই ব'লে ভাবিছ কি ঝরাইব নয়ন-আসার ?
পুরুষ কাঁদে না কভু, চিরকাল এক দাবি তার—
'তুমি যে আমার'।

আমার আমারই তুমি—এ জীবনে নাই বা পেলাম,
স্পষ্ট ভাষে দাবিটুকু শুধু আজ জানাতে এলাম।
বেদনার বিষভাণ্ড নিজহস্তে তুলিয়া খেলাম,
মরিয়া গেলাম।

নিষ্কৃতি পেলে না জেনো—চিরকাল রহিব ঘিরিয়া,
চন্দ্রালোকে, বর্ষা-রাতে দেখা দিব মরম চিরিয়া,
দিবারাত্রি জীবনের ছোট বড় শত ফাঁক দিয়া
আসিব ফিরিয়া।

চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারি না। এই যে সংযম, ইহাই তো জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। হয়তো তাই এত সুন্দর !

নগেনের ঘরে ঢুকিয়া দেখি—হৈ-হৈ ব্যাপার।

সেই ক্ষুদ্র-পরিসর ঘরের মধ্যে এক বিরাট ষাঁড়কে ঢোকানো হইয়াছে, রোগী তাহার পুচ্ছ স্পর্শ করিবে। গৌ-দান হইতেছে। অর্থাৎ মুমূর্ষু রোগী যদি এই কার্য্য না করে, তবে তাহার মৃত্যুর পর সে নাকি বৈতরণী পার হইতে পারিবে না।

দমিয়া গেলাম। শেষ অবস্থা নাকি? ষাঁড়টাকে কোনক্রমে বাহির করিয়া নগেনকে দেখিলাম। শক্ত ব্যাপার বটে—মেনিন্‌জাইটিস।

বাহিরে আসিয়া বসিলাম রোগীর ব্যবস্থাদি করিয়া। হাত-মুখ ধুইয়া একটু শুইবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার নিকট বসিলেন। ধপধপে গায়ের রঙ, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে বুদ্ধির জ্যোতি জ্বলজ্বল করিতেছে, কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটা টিকা। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি।

তিনি ইহাদের গুরু। নগেনের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীও। নগেনের কোষ্ঠীবিচার করিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আজ রাত্রি বারোটা যদি পার ক'রে দিতে পারেন, তা হ'লে ও এ যাত্রা রক্ষে পাবে। তা না হ'লে নয়। আপনি যে কোন ওষুধ দিয়ে, যেমন ক'রে হোক রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। আমিও ক্রিয়াকর্ম্ম যা করবার, তা করছি।

তাঁহার ভাষাটা অবশ্য সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দী, আমি তর্জ্জমা করিয়া দিলাম।

গভীর রাত্রি। কয়টা জানি না। আকাশে চতুর্দ্দিকে ঘন ঘটা, ঘন ঘন বিদ্যুৎ, অবিরাম মেঘ-গর্জ্জন। নগেনের

শয্যাপার্শ্বে একা বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প করিয়া ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

এই ফুলেশ্বরী!

নগেন প্রলাপ বকিতেছে। ফুলেশ্বরী তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। অনেক দিন হইল মারা গিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছে আর শুনিতেছে যে, তাহার স্বামী একবারও তাহার নাম করিল না, বার বার ডাকিতেছে ফুলেশ্বরীকে।

পাশের ঘরে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কুলগুরু রুষ্ট গ্রহের তুষ্টি-বিধানের জন্য হোমাগ্নি জ্বালিয়া স্তব পাঠ করিয়া চলিয়াছেন।

আমি অসহায়ের মত বসিয়া একটু একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

নগেন মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে, ফুলেশ্বরী!

নগেনের স্ত্রী বসিয়া চোখ মুছিতেছে।

বাহিরে মেঘ, জল আর বিদ্যুৎ।

হঠাৎ সব থামিয়া গেল যেন। বাহিরের মেঘ-গর্জ্জন কমিয়া গেল, প্রকৃতির শান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল। নগেন হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, একি, তুমি কখন এলে?

তাহার পর তাহার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, কমলা, বালিশটা একটু ঠিক ক'রে দাও তো।

কমলা কৃতার্থ হইয়া গেল। পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, কয়টা বাজিয়াছে?

দেখি, বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট। নগেন বাঁচিয়া গেল।

নগেন ভাল হইয়া গিয়াছে।

প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগিনেয় টাইফয়েডে ভুগিয়া ভাল হইয়াছে। ভাল হইয়া সে তাহার পাগল মামাটিকে লইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছে।

আমার প্র্যাক্‌টিস ক্রমশ বাড়িতেছে।

অন্তরের পিপাসাও বাড়িতেছে।

বাহিরে আমি এত ভদ্র, অথচ ভিতরে আমি এত বর্ব্বর! সেই আদিম যুগের কেভ্‌ম্যান আজিও আমার মধ্যে বাঁচিয়া আছে। সভ্যতার সমস্ত চেষ্টাই তো সে পণ্ড করিয়া দিতেছে। নীতিকথা বলিয়া কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না।

কিন্তু বাহিরের ভদ্র বেশও তো খুলিয়া উলঙ্গ পশুটাকে লইয়া সমাজে বিচরণ করিতে পারি না।

আমার মনে যে এত অশান্তি, এত দ্বন্দ্ব, বাহিরে আমাকে দেখিয়া কে তাহা বলিবে?

এই যে ডাক্তারবাবু!

সহাস্য নমস্কারে কহিলাম, আসুন।

রামগঞ্জে যেতে হবে একবার, কলেরা হয়েছে

চলুন।

৩

তুমি আমাকে ভালবাস না?

কোন উত্তর নাই।

বল না!

তথাপি কোন উত্তর নাই।

বল না!

কি বলব?

আমাকে ভালবাস কি না?

জানি না।

বলিয়া সে চলিয়া গেল। বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তবে কি আমাকে ভালবাসে না? কিন্তু আমার অন্তর্যামী তাহা তো স্বীকার করে না। কিন্তু বলে না কেন?

বসিয়া মনের গোপন গহন গভীরে,
কেন গো উতলা করিছ আকুল কবিরে,
ওগো, বল না!

তোমার স্বপন আমার নয়নে আঁকিয়া,
সুখ পাও কেন আড়ালে লুকায়ে থাকিয়া,
ওগো, বল না !
কাছাকাছি আছ, তবু মোরে ধরা দাও না—
তার মানে কি গো, মনে মনে মোরে চাও না,
ওগো, বল না !

তাই যদি হও, ডাক কেন নানা সুরেতে,
ভুলাইয়া কেন ল'য়ে যাও মায়া-পুরেতে,
ওগো, বল না !

সে যেন আবার আসিয়াছে। পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আছে। আমি ফিরিয়া চাহিলাম না, আপন মনে লিখিয়া চলিলাম। তাহার আঁচলের স্পর্শটুকু পিঠে লাগিতে লাগিল।

লঘু হাসি তব, অকারণে কাছে আসা এ,
চকিত চাহনি—নহে কি প্রণয়-ভাষা এ ?'
ওগো, বল না:!
নহে যদি তবে বল না কেন তা খুলিয়া,
সন্দেহটুকু দাও নাকো উন্মূলিয়া,
ওগো, বল না !

মনে হইল, যেন আনত নয়নে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখে লজ্জার স্নিগ্ধ শোভা। অধর কাঁপিতেছে।

সহজ নয়নে চাহ না মুখের পানে তো,
আঁখি নত কর—বুঝি না তাহার মানে তো,
ওগো, বল না !

ডাকি যবে তুমি চ'লে যাও সম্বরিয়া,
ডাকি না যখন, নানা ছলে এস সরিয়া,
ওগো, বল না!
যে কথা ঝলকে নয়নে অধরে পলকে,
যে কথা কাঁপিছে উড়ে-পড়া ওই অলকে,
ওগো, বল না!
ফুল ফুটে শেষে জান না কি যায় ঝরিয়া?
যৌবন, সখী, জান না কি যায় মরিয়া?
ওগো, বল না!

আরও কাছে সরিয়া আসিল। তবু ফিরিয়া দেখিলাম না; আমার কি অভিমান নাই? কবিতায় কিন্তু অভিমান ফুটিতেছে না, শুধু অনুনয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিখিয়া চলিয়াছি।

যে মন রেখেছি তব পায়ে দিব বলিয়া,
অকারণে, সখী, কেন যাও তারে দলিয়া,
ওগো, বল না!
ওই তো অধরে মুচকি হাসিটি ফুটেছে,
নয়নের কোণে শরম ফুটিয়া উঠেছে,
ওগো, বল না!
জানি মনে মনে, তবুও ভাষায় বল গো,
সে কথাটি যার লাগি আমি চঞ্চল গো,
ওগো, বল না!
বল না আমারে, বল বল সখী, বল না,
অকারণে কেন এত অকরুণ ছলনা,
ওগো, বল না!

ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে যেন দেখিতেছে। ফিরিয়া বসিলাম। সে তো নয়।

কে তুমি?

অপ্রস্তুত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি দুখিনী বাবু, শুনেছি, আপনার বড় দয়া। তাই সাহস—

দিনের বেলা আসতে কি হয়?

দিনের বেলা আপনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই।

কি হয়েছে তোমার?

দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় চাকা চাকা ঘা। নাকটা ফুলিয়াছে। ঠোঁটের কোণে সাদা সাদা ঘা। চক্ষু দুইটি লাল। কুষ্ঠ নয় তো?

কতদিন হয়েছে?

দু মাস থেকে।

ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে। খরচ লাগবে।

আমি গরিব মানুষ, আমাকে একটু দয়া করুন; ভগবান আপনার ভাল করবেন।

ভগবান রাজি হয়েছেন?

বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমাকে ভাল ক'রে দাও, ভাল ক'রে দাও, ভাল ক'রে দাও। দুই হাত বাড়াইয়া সে আমার পা দুইটি জড়াইয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলাম।

মহা মুশকিল! কি করা যায়?

বলিলাম, আচ্ছা আমার ফী দিতে হবে না। ওষুধের দামটা দিতে পারবে তো?

আমার কিছু নেই, আপনি দয়ার সাগর—

চুপ কর।

একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলাম, বত্রিশ দাগ ওষুধ পাবে। আর এস না আমার কাছে। ভাল যদি হয়, ওতেই হবে।

প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, টাকা পাইলে উহাকে বোধ হয় এত অযত্ন করিয়া দেখিতাম না। তাড়াতাড়িতে আন্দাজে সিফিলিসের একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিলাম। ঠিক হইল কি?

মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কাছে যেন ছোট হইয়া গিয়াছি।

৪

আমায় মাপ করবেন হরিশবাবু, আমি পারব না।

সেই আমার প্রতিবেশী হরিশবাবু। তিনি কেরানী, ইন্সিওরেন্সের দালালও। আমি তাঁহার কোম্পানির ডাক্তার।

তিনি একটি কেস আনিয়াছেন। লোকটা মোটা, ইউরিনে শুগার আছে। হার্টটাও সুবিধার নয়। হরিশবাবুর অনুরোধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রিপোর্ট যেন একটা লিখিয়া দিই। ফার্স্ট ক্লাস লাইফ না হইলে তাঁহার কোম্পানি লইবে না। কিন্তু তাহা কি করা যায়? দিনকে রাত্রি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। হরিশবাবু বলিলেন, কত কষ্টে কত খোশামোদ ক'রে লোকটাকে রাজি করালাম, আর আপনি দু মিনিটেব মধ্যে সব শেষ ক'রে দিলেন? আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। ছেলেটা আজ প্রায় মাসাবধি ভুগছে। ওষুধপথ্য যোগাতেই জিব বেরিয়ে যাচ্ছে। এই কেসটা হ'লে কিছু টাকা পাওয়া যেত, একটু বিবেচনা—

তা হয় না হরিশবাবু, মাপ করবেন।

মাপ আপনিই আমাকে করুন। ক'রে দিন দয়া ক'রে। আমার যে কি অবস্থা! আচ্ছা, ছেলেটির কি বাঁচবার আশা নেই?

শক্ত ব্যারাম, টাইফয়েড হয়েছে। বুঝতেই তো পারেন।

এসব জেনেও আপনি আমার অবস্থার প্রতি একটু দয়া করবেন না?

মাপ করুন।

হরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দিন তা হ'লে ছেলের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা লিখে।

ভাইটামিন ডি-টা ?

ওটা এখনও কেনা হয় নি। দেখি যদি আজকে—

হঠাৎ হরিশবাবু আমার হাত তুইখানা ধরিয়া বলিলেন, সত্যি, বড় তুরবস্থায় পড়েছি ডাক্তারবাবু, ওটা যদি ক'রে দিতে পারতেন !

তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল, তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন, এই দশটা টাকা না হয় আপনি—

কথা শেষ করিতে পারিলাম না। উত্তেজিত হইয়া হরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনি এমন ক'রে আমায় অপমান করতে সাহস করলেন ? আজ আমি না হয় কপাল-দোষে দরিদ্র হয়েছি, জানেন, আমি কত বড় বংশের ছেলে ? রতনগঞ্জের চাটুজ্জেদের নাম এখনও ও অঞ্চলে লোকে ভোলে নি। কম ক'রে তুশোখানা পাতা আমাদের বাড়িতে পড়ত, আর আপনি আজ দশটা টাকা আমাকে ভিক্ষা দিতে এলেন ! আপনার—

হরিশবাবু আর বলিতে পারিলেন না। তুই ফোঁটা জল তাঁহার চোখে টলটল করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

অপ্রস্তুতের চরম।

হরিশবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

বৈকালে হরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে দেখিতে গিয়াছি।

হরিশবাবু বাড়িতে নাই। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ বাবা, টাইফয়েড বলছ; কিন্তু ছেলে এমন বিড়বিড় ক'রে কি বকছে? মাঝে মাঝে আঁতকে উঠছে।

টাইফয়েড ওরকম হয়।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সেই যে সেদিন এক পাগলী ছেলেকে আঁকড়ে ধরেছিল, সে-ই কিছু নজর-টজর দেয় নি তো?

না না, ও কিছু নয়।

সেই দিন থেকেই বাছা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

কিছু বলিলাম না। একটু পরে বলিলাম, দেখুন, এই ওষুধটা রেখে দিন। রোজ দশ-বারো ফোঁটা ক'রে দেবেন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে—ভাইটামিন-ডি। ভুলবেন না যেন।

আচ্ছা। দাম কত এর?

দাম লাগবে না। এমনিই স্যাম্পল পেয়েছিলাম।

মিথ্যা কথা বলিয়া এত সুখ কখনও পাই নাই।

হরিশবাবু আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, আপনি তো কিছুতে দিলেন না; কিন্তু অল-ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্ট কেসটিকে বেশ বাগিয়ে নিলে। আর খগেন ডাক্তার কেমন সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস লাইফ রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে দেখে এলাম। আপনার যত সব ইয়ে—

চুপ করিয়া রহিলাম।

হরিশবাবুর স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, দেখ, আজ অয়েলক্লথ আনা দরকার একটা। বিছানা বড্ড ভিজে যাচ্ছে।

হরিশবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

গ্লুকোজটাও ফুরিয়েছে।

আচ্ছা।

কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, বলিলাম, এবার তা হ'লে উঠি।

রাত্রে—গভীর রাত্রে, হরিশবাবুর ছেলে মারা গেল। একা উৎকর্ণ হইয়া মায়ের বুক-ফাটা কান্না শুনিতেছি। পাশে মিলের বড় চোঙটা হইতে মৃদু শব্দ করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ।

মনে হইল, একটা পাগলী যেন হাসিতেছে।

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হইতে লাগিল। হয়তো ছেলেটার ভাল সেবা হয় নাই। ভিজা কাঁথায় শুইয়া শুইয়া, ভাল পথ্য না পাইয়া, বোধ হয় ছেলেটা মারা গেল। ছোট ছেলেরা তো প্রায় টাইফয়েডে মরে না। তবে?

দারিদ্র্য! হরিশবাবুর সেই লাইফটা ফার্স্ট ক্লাস লিখিয়া দিলে ক্ষতি ছিল কি? খগেন ডাক্তার তো দিয়াছে। আমাদের বিচারই কি নির্ভুল? ওই মোটা বহুমূত্ররোগী তাহার

খারাপ হার্ট লইয়া হয়তো বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবে, আর যে সব লাইফ ফার্স্ট ক্লাস বলিয়া লিখিতেছি—তাহারা হয়তো দুই দিন পরেই মারা যাইবে। কে জানে? হরিশবাবুর শুধু কিছু টাকা লোকসান করাইয়া দিলাম। কোন্‌টা ঠিক? সত্য কি?

মিলের চোঙে পাগলী হাসিতেছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, সে আসিয়াছে। দুই হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া চুম্বন দিয়া যেন বলিতেছে, তুমি ঠিক করেছ।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখন ভোর। তখনও হরিশবাবুর বাড়ির কান্না থামে নাই। পাগলীও সমানে হাসিয়া চলিয়াছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ। এলামেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সার বাঁধিয়া ভোরের আকাশে উড়িতেছে—যেন পাগলিনীর আলুলায়িত কেশভার।

৫

আমাকে রসুলপুর যেতে হবে।

নিরীহ গোয়ালা চুপ করিয়া গেল। রসুলপুর তাহার জমিদারের বাড়ি, সুতরাং সেখানেই আমার সর্ব্বাগ্রে যাওয়া

অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। তা ছাড়া গরিব মানুষ, ফী সব সময় দেয় না। মাঝে মাঝে দুধটা-দইটা দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে বলিলাম, ফেরবার পথে তোর ওখানে দেখে যাব; তুই বিকেলের দিকে বাড়িতে থাকিস। সে চলিয়া গেল।

ভাল আছেন তো ডাক্তারবাবু?

কে? দেখি আমাদের সেই মহিন্দর।

ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ, এই এক রকম চ'লে যাচ্ছে। কি মনে ক'রে?

বিশেষ কিছু নয়। একটু চুলকুনি হয়েছে, তাই—

দেখিলাম। সত্যই বিশেষ কিছু নয়। ঔষধ লিখিয়া দিলাম।

এইটে ঘ'ষে ঘ'ষে লাগাবেন। তা হ'লে আমি চলি? আমাকে অনেক ঘুরতে হবে এখন। আপনি কোথায় উঠেছেন? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

মহিন্দর দেখিলাম উসখুস করিতেছে।

বলিলাম, বেশ তো, আমার ওখানেই চাট্টি খাবেন। এই ভজুয়া!

ভৃত্য ভজুয়া আসিল। তাহাকে বলিলাম, বাবুকে বাইরের ঘরে বসতে দাও। ঠাকুরকে ব'লে দাও, উনি খাবেন এবেলা।

নানা স্থানে ঘুরিলাম।

কাহারও দাঁতে ব্যথা, কাহারও টাইফয়েড, কাহারও যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, বেরিবেরি—রোগের শেষ নাই। কাহারও আবার কিছুই নয়, মানসিক অস্বস্তি। দিব্য স্বাস্থ্য, তাহার কিন্তু বিশ্বাস, হজম হয় না। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হয়। অনেক বড়লোকের দেখি অসুখের কারণ—টাকা। হয় অত্যধিক খায়, নতুবা মাতাল, না হয় দুশ্চরিত্র। ইহার যদি কোনটাই না হয়, তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস যে, হয় তাহার ধাতুদৌর্ব্বল্য, না হয় ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ঘটিয়াছে।

সকলের ব্যবস্থা করি।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি, অর্দ্ধেক টাকা অচল।

বেলা দুইটায় ফিরিয়া শুনিলাম, মহিন্দর খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমিও উর্দ্ধশ্বাসে খাইয়া লইলাম। রসুলপুর যাইতে হইবে।

জমিদার-বাড়ির গাড়ি আসিল, প্রকাণ্ড মোটর।

যাইবার সময় আলোয়ানটা চতুর্দ্দিকে খুঁজিলাম। পাওয়া গেল না। ভজুয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল। আমিও করিলাম, আলোয়ানটা কিছুতে আর পাইলাম না। বাড়িতে একটা স্ত্রীলোক না থাকিলে চলা অসম্ভব। অন্তরলোক-বাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

মোটর ছুটিতেছে।

তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। স্পীড-এর যুগ। জীবনের গোনা দিন কয়েকটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। কতটুকু মানুষের আয়ু! যতটা পারি ছুটাছুটি করিয়া দেখিয়া লই। নাই বা হইল সবটা ভাল করিয়া দেখা। ক্ষণিকের চাক্ষুষ পরিচয়, সেটাও কি কম! সুন্দর ফুলে ভরা গাছটা, তাহার পর এক পাল গরু, একজন পথিক, একটা পুল, দুইটা কুকুর, আবার একটা গাছ, চমৎকার মেয়েটি, একরাশ ধূলা উড়াইয়া আর একটা মোটর, ধূলা ভেদ করিয়া এক ঝাঁক অশোকফুল চট করিয়া দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। বাঃ, পাশের মাঠে পুকুরটি কি সুন্দর! গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে, দুইটি বুড়া-বুড়ী মোট বহিয়া যাইতেছে, সাঁওতাল মেয়েটির যৌবন কি নিটোল, মুর্গীগুলা ছুটিয়া গেল—রোখো, রোখো। যাক, ছেলেটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

তীরবেগে ছুটিয়াছি।

এইরূপ তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যা-নাগাদ রসুলপুরে পৌঁছানো গেল।

রসুলপুরের জমিদার বছর দুই হইল মারা গিয়াছেন।

নিঃসন্তান যুবতী বিধবা রাণীজী সম্পত্তির অধিকারিণী।

আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন জমিদারের নূতন নায়েব—কুঞ্জলালবাবু। তিনিই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা এবং তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায়

জমিদারির উন্নতিও হইয়াছে বিস্তর। লোকটি, দেখিলাম, বিনয়ের অবতার।

আমি গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তিনি হেঁট হইয়া আমার পদধূলিই লইয়া ফেলিলেন। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, সেকি! আপনি ব্রাহ্মণ, তা বললে কি চলে?

রসুলপুর জমিদার-বাড়িতে এই আমার অল্পদিন যাতায়াত শুরু হইয়াছে।

নায়েবটিকে ইতিপূর্ব্বে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অসুখ কার?

ভেতরে আসুন, বসুন, ঠাণ্ডা হোন। অসুখের কথা তো হবেই।

ভিতরে গেলাম। গিয়া দেখি, সমারোহ-ব্যাপার। দুইজন ভৃত্য চেয়ার আগাইয়া দিল। হাতমুখ ধুইবার জল, চা, জলখাবার, পান, তামাক, বিনয়-বচন—ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল।

আমি যেন বাড়িতে জামাই আসিয়াছি। বলিলাম, চলুন, এবার রোগী দেখা যাক।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

অসুখ কার?

রাণীজীর।

পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, পাঁচ মাস হইবে। ভয়ের কারণ তো কিছু দেখিতেছি না, অথচ—। নিমেষের মধ্যে কারণটা বুঝিতে পারিলাম। বিধবা যে! হিন্দুর ঘরের বিধবা!

টাকার জন্যে নয়, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

হাজার টাকা পেলেও নয়?

না। আমাকে মাপ করবেন।

আশা করি, কথাটা গোপন রাখবেন।

নিশ্চয়।

ফী লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। এবারে কুঞ্জলালবাবুর পদধূলি লইবার আগ্রহ দেখিলাম না।

বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিয়াছি। সমস্ত অন্তঃকরণে দারুণ বিতৃষ্ণা। অনর্থক আমার এতটা সময় নষ্ট করাইল।

এই, রোখো।

নামিয়া পড়িলাম। সকালে কারু গোয়ালাকে বলিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় তাহার বাড়ি যাইব। মাঝামাঝি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়াই চলিলাম। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম খেয়াল নাই। বারুইপুর গ্রামের ভিতর

আসিতেই একটা কুকুর ঘেউঘেউ করিয়া উঠিল, চমক ভাঙিল।

সন্ধান করিয়া কারু গোয়ালার বাড়ি বাহির করিলাম।

কাছে গিয়া বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

কান্নার শব্দ।

আগাইয়া গেলাম। কারুর ছেলে একটু আগেই মারা গিয়াছে।

কলেরা হইয়াছিল।

সময়ে চিকিৎসা করিলে বোধ হয় বাঁচিত।

কালুর স্ত্রীর আর্ত্তনাদ কানে আসিতে লাগিল, ওগো ডাক্তারবাবু, এত দেরি ক'রে কেন এলে গো, আমার বাছা যে চ'লে গেছে।

৬

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া কিছু খাইলাম না।

মনটা খারাপ। ভজুয়া সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, একটু চা বানিয়ে দোব ?

উপুড় হইয়া শুইয়া ছিলাম। বলিলাম, না।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙিল, তখন চন্দ্র অস্তোন্মুখ। ম্লানায়মান

জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী তন্দ্রাতুর। আশ্চর্য্য মানুষের মন! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত-কিছু বিস্বাদ মনে হইতেছিল। এই নির্জ্জন শেষরাত্রে ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া করুণায় সমস্ত মন ভরিয়া গেল। অসহায় পৃথিবী ঘুমাইতেছে। আজন্ম রুগ্না। রোগের নানা যন্ত্রণার পর হঠাৎ যেন গভীর অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না যেন পৃথিবীর বিষণ্ণ হাসি।

সামনের বাগানটায় পায়চারি করিতেছি। শেফালি-ফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির। কে যেন সারারাত বসিয়া কাঁদিতেছে। কে সে? সে কি রাত্রে লুকাইয়া আসে?

নীরব চারিদিক,
গহন চারিধার,
এস না এ সময়ে
এস না একবার!
আকাশে তারা ছাড়া,
নাহি তো কারো সাড়া,
কেহ তো জানিবে না
এ নিশি-অভিসার!

বিরক্ত বোধ হইতেছিল।

দেখুন, আপনি আমাকে না চিনলেও নলিনীবাবুকে চেনেন তো? তিনি আমার পিসতুতো শালা হন। তা ছাড়া পূর্ণিয়ার যিনি আজকাল সব্‌জজ, তিনিও হলেন আমাদের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে বেয়াই বলতে পারেন। ওই যে আপনাদের মিলের ম্যানেজার সর্ব্বেশ্বরবাবু, তিনি হলেন গিয়ে আমার জাঠতুতো বোনের মামা। আপনাদের বাড়িও গেছি। তখন আপনি বোধ হয় খুবই ছেলেমানুষ। সেটা হবে গিয়ে নাইন্টিন টুয়েল্‌ভ। ওই যে নাম করছিলাম ব্রহ্মাপুরের ডাক্তার, তিনি হলেন গিয়ে আমার খুড়তুতো ভায়ের আপন শালা। তা ছাড়া এ অঞ্চলে আমাদের চেনা-শোনা ঢের লোক রয়েছে, ওই কালীকিঙ্কর—ওই যে কমিশনার সাহেবের ওখানে কাজ করেন, ওঁকে তো মেসো ব'লেই বরাবর ডাকি। তা ছাড়া আজকাল যিনি হরিহরপুরের দারোগা, তিনি হলেন আমার মামার শ্বশুর। আপনাদের পাড়াতেও রয়েছেন জীবনবাবু, তিনি গিয়ে—

তাঁহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝলাম। কিন্তু আপনি চান কি?

এই একটু দরকারে প'ড়ে এসেছি। খগেন ডাক্তারটা

এত বেশি টাকা চায় যে, আমাদের মতন গেরস্ত লোকের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আপনার শুনতে পাই দয়াধর্ম্ম আছে।

দরকারটা কি ?

একখানা সার্টিফিকেটের। খগেন ডাক্তার আমার পিসের ভাগনে কিনা, সেই ভরসায় গিয়েছিলাম। শিক্ষা হয়ে গেল। ষোল টাকা চায়—একটা সার্টিফিকেট দিতে ! ডাক্তার, না, ডাকাত !

আদ্যোপান্ত সব শুনিলাম। বলিলাম, আমায় মাপ করবেন। মিথ্যে সার্টিফিকেট আমি দিই না।

মিথ্যে মানে ? আমি যা বলছি, তা কি মিথ্যে ব'লে মনে করছেন ?

মিথ্যে ব'লে মনে করছি না। হতে পারে সত্যি। কিন্তু শোনা কথার ওপর নির্ভর ক'রে কোনও সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। ভদ্রলোকের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু, কানে গোছা-গোছা চুল, নাকের ভিতর দিয়া খানিকটা চুল দেখা যাইতেছে। অনুমান করিলাম, বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশেও রোমের অসদ্ভাব নাই। মাথায় টাক, গোঁফ-দাড়ি কামানো ; কিন্তু তিন-চার দিন বোধ হয় কামানো হয় নাই, খোঁচা-খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল।

আমার এমন বিপদে যদি সাহায্য না করেন, তা হ'লে যাই কোথায়, বলুন ?

কি করব বলুন, আমি নাচার।

ফী আমি আপনাকে দোব, তবে একটু কন্‌সেশন করতে হবে। চাকরি ক'রে সংসার চালাতে—

আমাকে মাপ করবেন, দিতে পারব না।

বেশ, পুরো ফীই দোব আপনার। কত নেন আপনি ?

টাকার জন্যে আটকাচ্ছে না। ওরকমভাবে আমি সার্টিফিকেট দিই না।

তবে কি বলতে চান, আমার চাকরিটা যাক ?

তার মানে ?

মানে, আমি দরখাস্ত করেছি যে, এই গ্রামে এসে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি চাই। তারা বলেছে, অবিলম্বে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দাও। এক মাস কামাই করেছি, এখন তার সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে হয়তো দূর ক'রে দেবে। করি কি বলুন তো ? মেডিকেল সার্টিফিকেট মানে—আপনি আর খগেনবাবু। খগেনবাবু ছুরি শানিয়ে ব'সে আছেন, আপনি বিবেক শানিয়ে ব'সে আছেন। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম তো !

ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু কুঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক বসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

ভজুয়া আসিয়া খবর দিল, বাহিরে দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। ঝাঁকড়া-ভুরু প্রশ্ন করিলেন, একটু বিবেচনা ক'রে যদি দেখতেন!

মাপ করবেন, পারব না।

ভদ্রলোক উঠিলেন। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি যেন মনে করবেন না, আমি অসুখে পড়ি নি। সত্যি, আমার অসুস্থতার জন্যেই আমি কাজে জয়েন করতে পারি নি। কিন্তু আমি কখনও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাই না। আমার নিজের হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে। নিজের চিকিৎসা নিজেই করি আমি। নিজের সার্টিফিকেটও যদি লিখতে পারতাম! যাই খগেনের কাছেই। He is more amenable to reasons. He sells his services, but at an exorbitant rate—এই যা মুশকিল।

হঠাৎ ভদ্রলোকের আলোয়ানখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল, ঠিক আমার আলোয়ানটারই মত।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আলোয়ানটা দেখছেন? কাল এই আলোয়ানটা কিনতে গিয়েই তো হাতের টাকা গেল ফুরিয়ে। তা না হ'লে খগেনের কাছেই নিতাম সার্টিফিকেট। বারো টাকায় ড্যাম চীপ। কি বলেন? এর দাম অন্ততপক্ষে ষাট টাকা।

বলিলাম, পঁচাত্তর।

ওঃ, তাই নাকি?

কোথা থেকে কিনলেন আপনি ?

আপনি চিনবেন কি ? ওপারের একটি লোক। মহিন্দর তার নাম। এসে বললে, ভাই, মুশকিলে পড়েছি, এই আলোয়ানটা রেখে কিছু টাকা দে। দেখে লোভ হ'ল। কিনে ফেললাম। ঠকি নি তো ?

না।

আমার আলোয়ান গায়ে দিয়া ঝাঁকড়া-ভুরু চলিয়া গেল। আমি বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। পুলিসে খবর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মনের ভিতর কে যেন বলিতে লাগিল, পুলিসেই যখন খবর দিলে না, একটা আইন যখন ভঙ্গ করিলে, তখন সার্টিফিকেটটাও দিয়া দিলে না কেন ? লোকটাও খুশি হইত, তোমারও টাকা হইত। তা ছাড়া, লোকটার সত্যই অসুখ করিয়াছিল তো। না হয় তোমাদের ঔষধ খায় নাই। ভজুয়া আসিয়া আবার খবর দিল, বাহিরে লোকেরা অপেক্ষা করিতেছে।

৮

গেলাম বাহিরে।

প্রথমেই দেখা হইল এক কাবুলীর সঙ্গে। সে সেলাম করিয়া সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, তাহার পারার ব্যারাম

হইয়াছে। চিকিৎসা করাইতে চায়। তাহাকে ব্যবস্থা দিবামাত্র সে যথারীতি ফী দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

আসিল একজন বাঙালী।

একটু প্রাইভেটে আপনার সঙ্গে 'টক' করব।

বেশ তো।

প্রাইভেটে 'টক' করিলাম।

কি মনে হচ্ছে আপনার?

আমার তো মনে হয় সিফিলিস।

কি ক'রে হ'ল?

সে তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

ভদ্রলোক একটু কাঁচুমাচু হইয়া গেলেন।

কখনও কোন ইম্‌পিওর কানেক্‌শন হয় নি আপনার?

জিব কাটিয়া তিনি বললেন, আজ্ঞে না।

তখন বলিলাম, রক্তটা পরীক্ষা করান তা হ'লে। আমার দেখে তো ওই ছাড়া আর অন্য কোন সন্দেহ হয় না।

আচ্ছা, গামছা-টামছার ছোঁয়াচ লেগে, কিংবা কিছু ডিঙিয়ে—

হ্যাঁ, হতে সবই পারে। ওই আকাশের সূর্য্যটাও এক্ষুনি দপ ক'রে নিবে যেতে পারে। আটকায় কে? সবই সম্ভব।

উপায়?

রক্ত পরীক্ষা করান। ইত্যবসরে এই ওষুধগুলা ব্যবহার করুন।

সচ্চরিত্র বাঙালী ভদ্রলোক বিদায় লইলেন। বলিয়া গেলেন, ফীটা পরে পাঠাইয়া দিবেন।

তারপর আসিল একজন মারোয়াড়ী। তাহার সিকায়েৎ অর্থাৎ ধাতু-দৌর্ব্বল্য। বগলে করিয়া এক বাণ্ডিল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন আনিয়াছে। দিল্লীর হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় বহু চিকিৎসকের দাওয়াই সে করিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হয় নাই। আমার নামডাক শুনিয়া সে অনেক আশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে—বিজলিকা ইল্‌হাজ করাইবার বাসনা। শেঠজী অনেক 'রূপেয়া' খরচ করিয়াছে এবং এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহার রোগটা সারিয়া যায়। দেখলাম, দুগ্ধবতী গাভী বটে, সামান্য একটি টর্চের সাহায্যে ইহাকে বেশ কিছুদিন দোহন করা চলে। কিন্তু কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, মামুলী একটা হজমের ঔষধ লিখিয়া দিয়া লোকটাকে বিদায় করিলাম। ফীটা কিন্তু শেঠজী নগদই দিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন ও-পাড়ার হারাণদা।

ওহে ডাক্তার, একটা ব্যবস্থা কর মাইরি। আর তো পারা যায় না। ভয়াবহ হয়ে উঠল ক্রমে।

ব্যাপার কি ?

গিন্নী আবার কাল রাত্তিরে একটি কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। এই নিয়ে পাঁচটি হ'ল—চারটি ছেলে ছাড়া। একটা উপায় বাতলাও ভাই। তা না হ'লে তো গেলাম।

কণ্ট্রাসেপ্‌শন না কি সব তোমাদের আজকাল আছে, তাই একটা কিছু করতে হচ্ছে এবার।

হাসিয়া বলিলাম, ফুল-প্রূফ কোন কণ্ট্রাসেপ্‌শন আছে নাকি? আমার তো জানা নেই।

তার মানে, আমি কি ফুল বলতে চাও?

তা না হ'লে ত্রিশ টাকা মাইনের ওপর নির্ভর ক'রে বিয়ে ক'রে বস।

তা হ'লে বাংলা দেশে কটা বাঙালী ছেলে বিয়ে করার উপযুক্ত আমাকে বল তো?

একটাও নয়।

তা হ'লে কি বলতে চাও, বাঙালীর বংশ লোপ হোক?

হোক না। ভিখারীর বংশবৃদ্ধি নাই বা হ'ল হারাণদা।

হারাণদা হাসিয়া বলিলেন, তাই বুঝি তুমি নিজে এখনও বিয়ে কর নি? রোজগার তো বেশ করছ, এবার একটা বিয়ে-থা কর। তোমার ছেলেপিলেরা তো আর ভিখারীর বংশধর হবে না।

বুঝিলাম, হারাণদার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে।

বলিলাম, আমরা সবাই সমান।

হারাণদা বলিলেন, এখনও রক্তের তেজ আছে, বুঝতে পারছ না, কিন্তু কিছুকাল পরে বুঝবে—ছেলেপিলে না থাকলে সংসার মরুভূমি।

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। 'শুভবিবাহ'-মার্কা লাল খাম। কে আবার বিবাহ করিতেছে! খুলিয়া দেখিলাম—জনৈক যাদুগোপাল বসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচুগোপাল বসাকের সহিত হারাধন দাসের কন্যা চঞ্চলা দাসীর শুভপরিণয় হইবে। আমি যেন সবান্ধবে—ইত্যাদি।

কে পাঁচুগোপাল বসাক?

খামের ভিতর হইতে আর একটা কাগজ বাহির হইল। হাতে-লেখা চিঠি; তাহাতে লেখা—

ডাক্তারবাবু, আশা করি মনে আছে। আমার যে স্ত্রীকে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছিলাম (সেই 'নন্দদুলাল' গান), তিনি আত্মহত্যা করিয়া মারা গিয়াছেন।

আবার বিবাহ করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সুখী হই। যদি আসিতে পারেন, অত্যন্ত আনন্দিত হইব।—পাঁচুগোপাল।

সেই সন্তান-লালায়িতা পাগলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে!

যাক।—উঠিয়া পড়িলাম।

হারাণদা বলিলেন, উঠলে যে!

আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, কি করতাম জানেন?

হারাণদা বলিলেন, কি?

সকলকে গুলি করতাম। তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দিতাম।

বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলাম। একবার মনে হইল, উক্ত

চঞ্চলা দাসীর পিতা হারাধন দাসকে টেলিগ্রাম করিয়া মানা করি যেন পাঁচুগোপালের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ না দেয়। উহার গনোরিয়া আছে। কিন্তু একটু আগে যেমন পুলিসকে খবর দিতে পারি নাই, ইহাও পারিলাম না।

অথচ বিবেক লইয়া বড়াই করি!

৯

ক্যাঁচ করিয়া বাড়ির সামনে মোটরটা থামিল।

একি, এ যে রসুলপুরের জমিদার-বাড়ির মোটর! ড্রাইভার আসিয়া সেলাম করিয়া একখানি পত্র হাতে দিল। খাম ছিঁড়িয়া দেখি—

এবারে অসুখ খুব মর‍্যাল এবং অত্যন্ত আর্জেণ্ট। আপনি পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসুন।—কুঞ্জলাল

চলিলাম। অরণ্যপ্রান্তর পার হইয়া মোটর ছুটিতেছে।

সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা সংক্ষেপে এই—আমি আমার ডাক্তারী বিবেক লইয়া যাহা করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম, একটা সামান্য দাই টাকার লোভে তাহা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি সাংঘাতিক।

কুঞ্জলালবাবু বলিলেন, আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু।

ভাবিয়া দেখিলাম, এখন তো আমার ডাক্তারী এটিকেটে বাধিবার কথা নয়। এখন সে রোগী; কারণ যাই হোক। বলিলাম, বেশ, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই জিনিসগুলো গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

এক্ষুনি।

গাড়ি ছুটিল।

রাণীজী প্রাণে রক্ষা পাইবেন, যদি আর কোন কম্‌প্লিকেশন না হয়। আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশল যেন সার্থক হইল। অথচ গোড়ার দিকটাই বা করিলাম না কেন? তাই ভাবিতেছি। সেই অসহায় শিশু তো রক্ষা পাইল না। সমাজ যাহাকে চায় না, তাহাকে বাঁচাইবে কে?

অথচ দাই না করিয়া আমি করিলে জিনিসটা এত অবৈজ্ঞানিকভাবে করিতাম না। শিশু তো গিয়াছে, জননীও যে যায়-যায়। যাই হোক, এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু—। যাক, আর ভাবিব না।

সমস্ত রাস্তা কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম। কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা! কতকগুলো অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাটে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আর কিছুই নয়, ফাঁকি। একই বিবেক নানা কথা কয়। যাহা যুক্তিযুক্ত, বিবেক তাহা করিতে চাহে না; যাহা অন্যায়

বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে দেখি বিবেকের সায় আছে। বিবেক মানে যুক্তি-মার্জ্জিত বুদ্ধি নয়, বিবেক—সামাজিক বুদ্ধি। এই বিবেক-বলেই লোকে এককালে সতীদাহ করিত, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিত; আজও সেই বিবেকই কাপালিককে নরবলিতে প্রণোদিত করে, বিধবাকে উপবাসে দেহ শীর্ণ করিতে পরামর্শ দেয়, অসুখে পড়িলে ঔষধ না খাইয়া মাতুলি লইতে প্রলুব্ধ করে। সেই এক জাতীয় বিবেকই ডাক্তারকে নির্ব্বিচারে একটা পশু করিয়া ফেলিয়াছে। সে ফর্ম মানিয়া চলিয়াছে, যুক্তির ধার ধারে না।

তা ছাড়া আমরা করিতেই বা পারি কি? কতটুকু ক্ষমতা আমাদের? যাহার জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিলাম, ঔষধের পর ঔষধ দিলাম, রক্ত মল মূত্র সমস্ত পরীক্ষা করিলাম, ব্যাধি হয়তো ধরা পড়িল, হয়তো পড়িল না। ধরা পড়িল, কিন্তু তবু সারিল না। ধরা পড়িল না, অথচ সারিয়া গেল।

ইহাতে কি প্রমাণ হয়? আমরা অসহায়, নিতান্ত অসহায়। অথচ রোগী মনে করে, আমরা যেন তাহার প্রাণটা পকেটে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের টাকা, খোশামোদ—নানা প্রকারে স্তুতি করিয়া চলিয়াছে সে।

বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় রাত্রি নয়টা। আমি নামিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক আসিয়া প্রণাম করিল।

কে ?

নতমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, আমি আসমানি।

কি চান আপনি ?

কিছু নয়। এমনই দেখা করতে এসেছিলাম।

বেশ, ভেতরে আসুন।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গেলাম। চিনিতে পারিলাম না।

কে আপনি ?

আমাকে চিনতে পারছেন না ? এই কিছুদিন আগে আপনার কাছে এসেছিলাম। সেই যে আর একদিন সন্ধ্যে-বেলা—। আমার গা-ময় ঘা ছিল। আপনি একটা টাকা দিয়ে আমাকে একটা ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিলেন, সেই ওষুধ খেয়ে আমার সব সেরে গেছে। আরও খেতে হবে কি ?

আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। নিতান্ত অবহেলাভরে তাহাকে যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার এই ফল দেখিয়া আমার নিজেরই মুখে কথা সরিতেছিল না। এত অসামান্য রূপ তাহার ওই কদর্য্য রোগটার তলায় চাপা পড়িয়াছিল, আশ্চর্য্য !

বলিলাম, আচ্ছা, আর এক শিশি কিনে খেও। হাতে পয়সা আছে তো ? কোথা থাক তুমি ?

রংবাজারে। হ্যাঁ, এবার আমি কিনে খেতে পারব।

বুঝিলাম, রূপজীবিনী সে। স্বাস্থ্য ও রূপ যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন তাহার পয়সার অভাব কি?

সে চলিয়া গেল। আমি বিবেককে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটাও কি ঠিক কাজ হইল? এমন একটা মোহিনী অগ্নিশিখাকে সমাজে ছাড়িয়া দিয়া কি সৎকার্য্য করিলে! এ তো নিবিয়া গিয়াছিল প্রায়। আমিই তো আবার তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিলাম। উচিত হইল কি?

হারাণদা আসিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তার, হরিশবাবুর সঙ্গে কি তোমার কোন ঝগড়া হয়েছে নাকি?

বলিলাম, না। কেন বল তো?

তিনি তোমার নামে নানা রকম সব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। তুমি নাকি তাঁর ছেলের অসুখের সময় গলায় পা দিয়ে তোমার প্রাপ্য আদায় করেছ! ফী পাও নি ব'লে সময়মত নাকি যাও নি! বেঘোরে ছেলেটা তোমার হাতে প'ড়ে বিনা চিকিৎসায় নাকি মারা গেছে!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সেদিন খগেন ডাক্তারের ওখানে ব'সে তোমার খুব নিন্দে করছিলেন হরিশবাবু। তুমি নাকি দাম্ভিক!—কত রকম সব বলছিলেন।

সামান্য একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হারাণদা বলিয়াই চলিলেন, তোমার নাকি স্বভাব-চরিত্রও আজকাল খুব খারাপ হয়ে উঠেছে! ভদ্রলোকের বাড়িতে নাকি তোমাকে ডাকা বিপজ্জনক!

কি রকম?

রংবাজারের একটা মাগী নাকি তোমার বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা আসে! হরিশবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন। তা ছাড়া তুমি নাকি কচি বয়সের একটা ঝি রেখেছ আজকাল! তোমার না চাকর ছিল আগে একটা?

হ্যাঁ, ঝিটা তারই বউ। সে ছুটিতে বাড়ি গেছে। তার স্ত্রী তার হয়ে কাজ করছে। সে নিজেই রেখে গেছে। আমি বাহাল করি নি।

তোমার রান্না করে কে?

ওই ঝি।

বল কি? ওর হাতে খেতে তোমার প্রবৃত্তি হয়?

ওর স্বামীর হাতে খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল, ওর হাতেই বা হবে না কেন?

হারাণদা একটু চুপ করিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে বলিলেন, এটা ঠিক নয়, ডাক্তার। বলা যায় না কিছুই, দুর্ব্বল মানুষের মন তো। বিচলিত হতে কতক্ষণ?

বিচলিত হয় বইকি।

বল কি?

হ্যাঁ, এখন যেমন বিচলিত হয়েছে তোমার নাকে একটা ঘুষি মারবার জন্যে। এ ইচ্ছাকে যেমন দমন করছি, তেমনই সে ইচ্ছাও দমন করি। ভয় পেও না।

হারাণদা বলিলেন, আমার নাকে তোমার ঘুষি মারতে ইচ্ছে করছে? অপরাধ আমার?

কি দরকার ছিল তোমার এই সব সুসংবাদগুলি বহন ক'রে এনে আমার এমন নির্জ্জন অবসরটা মাটি করবার? কি অপরাধ করেছি তোমার? তোমার বাড়িতে বিনা-পয়সায় দেখি এবং তোমার সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করি, এই?

হারাণদা বলিলেন, আহাহা, অত চট কেন? তোমাকে ভালবাসি, তাই বলছি। না হ'লে কি দরকার আমার?

আচ্ছা, এখন উঠি তা হ'লে।—ভিতরে চলিয়া গেলাম।

নির্জ্জন বাড়ি। এলোমেলো বিছানা। বিছানার উপর একগাদা বই—অগোছালো পড়িয়া আছে। মশারির খানিকটা হাওয়ায় উড়িতেছে। চায়ের বাটিটা পিরিচের উপর কাত হইয়া পড়িয়া আছে—সকালে-খাওয়া চা এখন পর্য্যন্তও ধোওয়া হয় নাই। ঘরে চাবি দেওয়া ছিল, চাকরানীর দোষ নাই। সামনের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবির উপর দেখিলাম, একটা টিকটিকি—লাঙুল আস্ফালন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর ছবির উপরে আর একটা। তাহারও লাঙুলে শিহরণ। একটা বই লইয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িলাম। বইটা খুলিতেই একটা দশ টাকার নোট বাহির

হইয়া পড়িল। কবে যেন রাখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। চাঁদ আর মেঘে লুকোচুরি—পুরাতন ছবি, অথচ চিরনূতন।

উতরোল নদীজল কহে থাকি থাকি,
তরী ভাসিল না।
ভাসিতেছি ব'সে ব'সে একান্ত একাকী,
ভালবাসিল না।
দীর্ঘ দিবা-বিভাবরী সমস্ত অন্তর ভরি
রয়েছে তবুও তারে বাহিরে সন্ধান করি।
অন্ধকারে ধীরে ধীরে শেফালি পড়িছে ঝরি,
সে তো আসিল না!
ভাবিতেছি ব'সে ব'সে একান্ত একাকী,
ভালবাসিল না।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ-গগনে,
অনামা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে হায়,
উতলা পবনে।
মনে হয়, চিত্ত মোর ফুটিয়াছে কদম্বশাখায়,
ছুটিয়াছে মহাশূন্যে বিহঙ্গের উড়ন্ত পাখায়,
বিগলিয়া পড়িতেছে চাঁদিনীতে বিনিদ্র রাকায়
—স্বপনে স্বপনে।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ-গগনে।

কোথায়? মানুষের কথার এত মূল্য? একবার কথা দিলে তাহার আর নড়চড় হইবার জো নাই? ভালবাসার মূল্য নাই, কথারই মূল্য? আশ্চর্য্য আমাদের সমাজ!

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

একি, এ যে হরিশবাবু!

কি খবর?

একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে। আমার স্ত্রীর হঠাৎ পেটে বেদনা উঠেছে একটা, ছটফট করছে।

হারাণদার কথা মনে পড়িল। মনে করিলাম, যাইব না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, হরিশবাবুর স্ত্রী তো কোন দোষ করেন নাই। ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

হরিশবাবুর ব্যবহারে মনটা ভাল ছিল না।

এমন সময় সকালবেলা ডাকাডাকি করিয়া এক ভদ্রলোক আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখি, একজন চেনা উকিল—দাঁড়াইয়া চশমা মুছিতেছেন।

কিছু মনে করবেন না, ঘুমটা ভাঙালাম।

না না, কিছু না। বসুন। কি খবর?

দুঃসংবাদ। ডাক্তারের কাছে যখন এসেছি, তখন বিপদ নিশ্চয়ই কিছু। তবে একটু 'ফেভার' করতে হবে।

বিরক্ত হইলাম।

বলিলাম, ব্যাপারটা কি আগে শুনি ?

উকিলবাবু আবার চশমা মুছিতে শুরু করিলেন। ফুলহাটির নন্দ মিত্তিরদের চেনেন তো ? তাদেরই ফ্যামিলির। আজ-কাল বেচারারা বড় গরিব হয়ে পড়েছে। তার ওপর রোগও ধরেছে বিষম। চিকিৎসাও হ'ল অনেক রকম। ডাক্তারি, কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, হকিমি পর্য্যন্ত। উপস্থিত গঙ্গার ধারে চেঞ্জে আছেন। দেখে ভারি কষ্ট হয়। আপনি তার চিকিৎসার ভারটা নিন।

রূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিলাম, এসব কেসে ফেভার করতে পারব না, মাপ করবেন। আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হ'লে ফী লাগবে।

বড় গরিব কিন্তু।

বেশ তো, আপনার যখন দয়া হয়েছে, আপনিই তাঁর হয়ে ফীটা দিয়ে দিন। আপনি তো গরিব নন। দয়া জিনিসটাও খারাপ নয়। কিন্তু আপনার মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল, তার জন্যে আমার আর্থিক লোকসান করাটা কি ঠিক ?

চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, বেশ তো, ফী আপনার দেওয়া যাবে। কিন্তু ডাক্তারদের কি দয়া-ধর্ম্ম থাকতে নেই ? লোকে তো বলে, আপনার দয়া-ধর্ম্ম আছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমার স্বকীয় দয়ার দরুন যা আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক অশান্তি, তা তো আমাকে ভোগ

করতেই হয়। তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। দুনিয়ার লোকের দয়ার বোঝা যদি আমাকে বইতে হয়, তা হ'লে তো আমি নাচার। আমি অক্ষম, স্বীকারই করছি।

উকিল-ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নীরবে চশমা মুছিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, বেশ, তা হ'লে যাচ্ছেন কখন?

বিকেলের দিকে যাব। চারটে পাঁচটা আন্দাজ।

বেশ, তাই ঠিক রইল। যাই তা হ'লে।—বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলাম, বসুন, বসুন। চা-টা খেয়ে যান। অত রাগ করছেন কেন?

উকিলবাবু আবার বসিলেন।

বলিলাম, দেখুন মশাই, আমার ক্রমশ ধারণা হচ্ছে যে, দয়া-দাক্ষিণ্য ক'রে আমরা কিছুতেই কারও উপকার করতে পারি না, অন্তত এদেশে। ওদেশে কি হয় জানি না। নিন, সিগারেট নিন।

উকিলবাবু বলিলেন, দয়া-দাক্ষিণ্য ক'রে উপকার করতে পারছেন না, মানে? বুঝলাম না।

তার মানে, আমি যদি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করি, তা হ'লে আমাকে কেউ আর ডাকবে না। কেউ ডাকেও যদি, তা হ'লেও আমি যা বলব, তা করবে না। আমার প্রেস্ক্রিপ্শনের ওপর ভক্তি ক'মে যাবে।

না না, তা কি কখনও হয়?

আমি নিজে দেখেছি, তাই বলছি। এই সেদিনই তো

আমাদের পাড়ার একটা লোককে দেখে হঠাৎ আমার করুণার সঞ্চার হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোর? সে বললে যে, বিগত তিন মাস যাবৎ সে জ্বরে ভুগছে। পেটে পিলে লিভার আর জল। দীন দরিদ্র অসহায় ভেবে দয়ার সঞ্চার হ'ল। নিজের সময় খরচ ক'রে তার রক্ত-পেচ্ছাব পরীক্ষা করলাম, দেখলাম, কালাজ্বর। রীতিমত ইন্‌জেক্‌শন না দিলে ম'রে যাবে। কি করি, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ওষুধ কিনে তার চিকিৎসা শুরু করলাম। ফল কি হ'ল বলুন দেখি?

আশা করি, সে ভালই হযেছে।

না। সে দুটো ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে স'রে পড়েছে। খবর নিয়েছি, সে এখন রামু কবরেজের দাবাই করছে এবং তার মা নিজের খাড়ু বিক্রি ক'রে অর্থ সরবরাহ করছে। What do you say?

সব ক্ষেত্রেই যে লোকে এমন অকৃতজ্ঞ হবে, তা কে বললে আপনাকে?

আহা, আপনি বুঝছেন না। এটা অকৃতজ্ঞতা নয়, এইই মানুষের স্বভাব। যা সুলভ, আমরা তার মূল্য বুঝি না। দুর্লভের দিকে আমাদের স্বাভাবিক টান। আপনারও, আমারও।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আপনি যদি নিজে আজ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে আমাকে ডাকেন এবং আমি যদি বিনা পয়সায় আপনার

চিকিৎসা শুরু করি, তা হ'লে বড় জোর তিন-চার দিন আপনি আমার চিকিৎসায় টিকে থাকবেন। যদি আপনি ভদ্রলোক হন, আপনি আমাকে বলবেন, অমুক ডাক্তারকে একবার কনসাল্ট করলে হ'ত না? অমুক ডাক্তারকে আপনি তখন টাকা দিয়ে ডেকে তৃপ্তি পাবেন। আপনার টাকা যদি বেশি থাকে, তাতেও আপনার তৃপ্তি হবে না, যতক্ষণ কলকাতা থেকে কোন হোমরা-চোমরা ডাক্তার এসে আপনাকে শোষণ না করছেন। এই করবেন, যদি আপনি ভদ্রলোক হন। আর যারা অভদ্রলোক—যা আমাদের দেশের অধিকাংশ—তারা তিন দিন জ্বর ছাড়তে না দেখলে চতুর্থ দিন আপনাকে না ডেকে বেশি-ফী-ওলা একজন ডাক্তার ডাকবে, আপনার নিন্দে করবে এবং যেহেতু তাকে টাকা দিয়ে ডেকেছে, সেইহেতু তার ওষুধ শেষ পর্য্যন্ত খেয়ে দেখবে। টাইফয়েড অবশ্য যখন সারবার, তখন আপনি সারবে। কিংবা সারবার না হ'লে সারবে না। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয় না। ওটা একটা সস্তায় নাম কেনবার উপায়—আহা, অমুক ডাক্তার দয়ার অবতার! কিন্তু আশ্চর্য্য, অসুখ একটু শক্ত হ'লেই লোকে 'অবতার'কে ত্যাগ ক'রে চামারের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মনুষ্য-ধর্ম্ম।

উকিলবাবু তখন বলিলেন, কি জানি মশায়!

জানাজানি কিছু নেই, এই হ'ল ফ্যাক্ট। আপনার এই মিত্তির মশাই, ইনি এত চিকিৎসা যে করিয়েছেন, খুব সম্ভবত

কাউকে রীতিমত পয়সা দেন নি। তাই নানা চিকিৎসক চেখে বেড়াচ্ছেন।

হ্যাঁ, তা বটে। সবাই ওঁর ওপর দয়াই করেছেন।

Here you are। সেইজন্যে কারও ওপর বিশ্বাস হয় নি। কারও ওষুধও উনি বোধ হয় ভাল ক'রে খান নি।

আজ বিকেলে তা হ'লে—

হ্যাঁ, চারটের সময় যাব।

উকিলবাবু বিদায় লইলেন।

উঠিতে যাইব, এমন সময় ব্যাগ-হস্তে এক এজেণ্টের প্রবেশ।

নমস্কার। আজ তিন দিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি অমুক কোম্পানিকে রেপ্রেজেণ্ট করছি।—বলিয়া তিনি একখানি কার্ড হাতে দিলেন এবং বলিলেন, এই সব আমাদের লিটারেচার, এই একখানা আপনার জন্যে ডায়েরি, আর এইগুলো সব স্যাম্পল।

ধন্যবাদ।

এই ওষুধটা আপনি ট্রাই করেছেন?—বলিয়া তিনি একটা ঔষধের স্যাম্পল তুলিয়া দেখাইলেন।

না, ওটা এখনও দেই নি কাউকে। নামই মনে থাকে না।

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, ওটা ট্রাই ক'রে দেখুন। থাইসিসে একেবারে ওয়াণ্ডারফুল। কলকাতায় ডক্টর অমুক,

ডক্টর তমুক এ ছাড়া তো আজকাল কিছু লেখেনই না।—বলিয়া তিনি কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারের নামই করিলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন না, কত টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছেন। —বলিয়া একগোছা ছাপানো কাগজ আমার নাসিকাগ্রে ধরিয়া দিলেন। দেখিলাম, নামজাদা কয়েকজন ডাক্তারের সহি-করা প্রশংসাপত্র রহিয়াছে বটে। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

বলিলাম, দেখুন, ওসব ডাক্তারদের নাম বেশি করবেন না আপনারা আমাদের কাছে। তা হ'লে আপনাদের ওষুধের প্রতি যা-ও আমাদের একটু শ্রদ্ধা আছে, ক'মে যাবে। ওসব ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার ধারণা কি জানেন ?

কি ?

ওঁরা হাতুড়ে ডাক্তার—ডাক্তারী খেতাবধারী পেটেণ্ট মেডিসিনের ভেণ্ডার। ওঁরা দেশের দুঃখ বোঝেন না, রোগীর ভালমন্দ বিচার করেন না, যে ওষুধের বিজ্ঞাপন পান, সঙ্গে সঙ্গে তাই লিখে দেন। যাঁর প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন যত দুষ্প্রাপ্য, তিনি তত বড় ডাক্তার। সুতরাং ওঁদের কথার ওপর সত্যিকার ডাক্তার যাঁরা, তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয় রোগীর খাতিরে, দায়ে প'ড়ে—স্বেচ্ছায় নয়।

রোগীর খাতিরে কেন ?

কারণ, রোগীর বিশ্বাস, কোন বড় ডাক্তার দেখলেই রোগ সেরে যাবে। দামী ওষুধ না খেলে ব্যারাম দমবে না।

রোগীরা বৈজ্ঞানিক নয়, তারা সাধারণ মানুষ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে—যা দুর্লভ, তাই পাবার চেষ্টা করা। আমরা অনর্থক স্বাভাবিক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করব কেন? রোগ যদি দুঃসাধ্য হয়, রোগীর যদি পয়সা এবং বিশ্বাস থাকে, আমরা তাকে তার বিশ্বাস-অনুসারে চলতে বাধা না দিয়ে তাকে কোন বড় ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়ে আসি। মরা-বাঁচা! কে কিসে মরে, কে কিসে বাঁচে, জানি না। তবে আপনি যেসব ডাক্তারের নাম করছেন, ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। ওঁরা ব্যবসাদার, বুদ্ধিমান, ধনবান; কিন্তু বৈজ্ঞানিক নন। দরকারে পড়লে ওঁদের শরণাপন্ন হই, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারি না।

এজেণ্ট ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি যা বলছেন, তাই বোধ হয় ঠিক। কি করব বলুন মশাই, আমাদের চাকরি করতে হয় পেটের দায়ে। কোন্ ওষুধ ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে আপনারাই বোঝেন। তবে এটা ঠিক, এই অঞ্চলে যদি এ ওষুধটার সেল না বাড়ে, তা হ'লে হয় আমাকে আসাম অঞ্চলে বদলি করবে, না হয় দূর ক'রে দেবে।

চকচকে স্যুটের ভিতর হইতে সহসা দীন দরিদ্র বাঙালীমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিল।

প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না।

উপরন্তু বলিতে হইল, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব। মুশকিল কি জানেন, এসব ওষুধের কম্পোজিশন প্রভৃতি না জেনে লিখতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।

কলকাতায় ওঁরা তো বেশ লেখেন।

হ্যাঁ, সে তো জানি। সেজন্যে আমাদের মাঝে মাঝে অপবাদও সহ্য করতে হয় যে, আমরা আপ-টু-ডেট নই। অনেক রোগী এজন্যে হাতছাড়াও হয়ে যায়। আচ্ছা, রেখে যান, লিটারেচারটা প'ড়ে দেখব।

এজেণ্ট বিদায় লইলেন।

আসিলেন হারাণদা, তাঁহার স্ত্রীর জ্বর ছাড়িতেছে না।

হারাণদার সহিত আসিলেন কুমুদবাবু। তিনি হারাণদার প্রতিবেশী, সবজান্তা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কুইনিনটা আর কত দিন দেবেন?

আরও দিন দুই চলুক।

আর কুইনিন দেওয়াটা কি ঠিক? ওটা শুনেছি পয়জন, শরীর গরম করে।

ইচ্ছা করিল, ঠাস করিয়া একটা চড় মারি।

তৎপরিবর্ত্তে হাসিয়া বলিলাম, না, ওতে কিছু হবে না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আসিলেন রামবরণ সিং। ইনি তেজস্বী পুরুষ। রাগিয়া একজনের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ফাটা-মাথার আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। এখন মকদ্দমা বাধিয়াছে। রামবরণ সিং আসিয়াছেন আমার কাছে

তদ্বির করিতে। আমি একজন প্রধান সাক্ষী। রামবরণ সিং ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

তৃণখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছি।

বৈকালে ফুলহাটির মিত্রবংশের বংশী মিত্রকে দেখিতে গেলাম। গেটে ঢুকতে গিয়া দেখি, চার-পাঁচটা ছাগল রহিয়াছে। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছাদের ওপরেও অনেক ছাগল, আলিসা হইতে গলা বাড়াইতেছে। কি সর্ব্বনাশ, বারান্দা যে ছাগলে পরিপূর্ণ! ব্যাপার কি? ছাগলের রাজত্ব যে!

বৈঠকখানায় বসিয়া ভিতরে খবর পাঠাইলাম। বৈঠকখানাতেও দেখিলাম, ছাগলের অভাব নাই। স্বচ্ছন্দে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এত ছাগল কেন এ বাড়িতে? আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উকিলবাবু বাহিরে আসিলেন। উকিলবাবুটি ইঁহাদের নিকট-আত্মীয়। বলিলেন, চলুন ভেতরে।

ভিতরে রোগীর ঘরে দেখি, সেখানেও ছাগল। ইহাদের কি মাথা-খারাপ?

জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

এত ছাগল কেন বলুন তো—চতুর্দ্দিকেই দেখছি?

ওঁর বুকের ব্যারাম কিনা! কবিরাজ মশায় বলেছেন, বাড়িতে ও রোগীর ঘরে ছাগল রাখতে।

সর্ব্বনাশ! তাই ব'লে এত ছাগল!

রোগীকে পরীক্ষা করিলাম।

বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভদ্রলোক। মুখময় পাকা দাড়ি ও গোঁফ, ক্রমাগত কাসিতেছেন। সর্ব্বদা জ্বর ভোগ করিতেছেন। বুঝিতে দেরি হইল না যে, যক্ষ্মাই হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় রোগ ঠিকই ধরিয়াছেন। সে কথা আর রোগীর সম্মুখে উচ্চারণ করিলাম না। ছাগল-প্রসঙ্গ চালাইব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দিন থেকে এসব ছাগল পুষছেন? হঠাৎ পাশের ঘর হইতে নারীকণ্ঠে একজন উত্তর দিল, আমি তো বিয়ে হয়ে অবধি দেখছি এই ছাগল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, পর্দ্দার অন্তরালে কেহ দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন।

বলিলাম, ছাগল রাখা এ ব্যারামের পক্ষে ভালই।

পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কোন জবাব আসিল না।

উকিলবাবু বলিলেন, চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে বসি। আপনার দেখা হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, চলুন।

বাহিরে গিয়া দেখি, বৈঠকখানায় যে চেয়ারটায় আমি বসিয়া ছিলাম, তাহার উপর স-দাড়ি এক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে।

বলিলাম, ছাগল তো একটা সমস্যা দেখছি এ বাড়িতে!

বলেন কেন? তাড়ান দেখি আপনি একটি ছাগল, বংশী-বাবুর মা তা হ'লে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না।

বংশীবাবুর মা বেঁচে আছেন নাকি?

চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, তা আছেন। মহা মুশকিল! কি রকম বুঝলেন?

বুঝলাম যা, তা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ উনি বাঁচবেন না। থাইসিস হয়েছে।

দ্রুততর বেগে চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু বলিলেন, বলেন কি? থাইসিস তো ভারি ছোঁয়াচে রোগ, না?

হ্যাঁ, ছোঁয়াচে বইকি।

আপনি থাইসিস ব'লে ডিক্লেয়ার করছেন?

আশঙ্কা করছি। কোন জিনিস জোর ক'রে ডিক্লেয়ার করার মত অহঙ্কার আমার নেই। মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত থাইসিসই। স্পিউটামটা পরীক্ষা ক'রে দেখলে অনেকটা বোঝা যাবে।

তাই করুন তা হ'লে।

কাল তা হ'লে স্পিউটাম পাঠাবেন আমার কাছে। আর এক কথা। রোগীকে এসব কথা বলবেন না যেন। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, কবরেজী চিকিৎসা যেমন চলছে চলুক না। আমাকে আর কেন জড়াচ্ছেন ওর মধ্যে?

না না, আপনাকে কেসটা হাতে রাখতে হবে। আপনার ওপরই আমাদের ফেথ বেশি। বিনা বাক্যব্যয়ে সকালের সেই নূতন ঔষধটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনে লিখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আসিবার সময় উকিলবাবু পুরা ফীই দিলেন।

পরদিন সকালে বংশীবাবুর স্পিউটাম পরীক্ষা করা হইল, যক্ষ্মাই হইয়াছে।

রোজই বৈকালে মৃত্যুপথযাত্রী বংশীবাবুর বাড়ি যাইতে হয়। বাঁচিবে না জানিয়াও যাইতে হয়। লম্বা-চওড়া কথাও বলিতে হয়। থাইসিস শুনিবার পর হইতে উকিলবাবুটি কিন্তু আর এ বাড়িতে পদার্পণ করেন না।

সাবধানী লোক।

প্রায় এক মাস পরে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বংশীবাবুর বাড়িতে গিয়াছি।

বাড়িতে তিনটি প্রাণী। রুগ্ন বংশীবাবু, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং বংশীবাবুর স্ত্রী। উকিলবাবু আর আসেন না। ঝি-চাকর আছে, তাহারাই কাজকর্ম্ম সব করে।

আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। বংশীবাবুর মাতা আমাকে পুত্র-সম্বোধন করিয়াছেন, এবং বংশীবাবুর স্ত্রীও আমার সামনে বাহির হইতেছেন। অল্প বয়স, বছর কুড়ি-বাইশ হইবে।

বংশীবাবুর স্ত্রীর মত অসামান্যা রূপসী সচরাচর চোখে পড়ে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়া দেখি, বংশীবাবুর স্ত্রী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিলেন, আসুন, বসুন।

বলিলাম, মা কোথায় আপনার?

তিনি শিবমন্দিরে পূজো দিতে গেছেন।

তা হ'লে বংশীবাবুকে দেখি গিয়ে, চলুন। কেমন আছেন আজকাল? কাল টেম্পারেচার কত উঠেছিল?

১০১ পর্য্যন্ত। আপনি কিন্তু এক্ষুনি পালাতে পারবেন না। মা ব'লে গেছেন যে, আপনি এলে যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেন। আমি চুলটা ওঘরে ততক্ষণ বেঁধে নিই। তারপর ওই সব ছাগল তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাতে হবে। এ এক ভাল কাজ হয়েছে আমার!

বধূ চলিয়া গেলেন। আমি বংশীবাবুকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, ক্রমশই দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। বংশীবাবু রোগ-বিষয়ক নানা প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন।

আর রোগ সারিতে কতদিন লাগিবে, হার্টটা কেমন?—ইত্যাকার নানারূপ প্রশ্ন।

দেওয়ালে একটা ঘড়ি টক টক টক করিয়া শব্দ করিতেছে।

আশেপাশে ছাগল ঘুরিতেছে।

বংশীবাবু কাসিতেছেন আর প্রশ্ন করিতেছেন।

আমি বসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া চলিয়াছি।

মিনিট পনরো পরে চামচিকার মত একটি শিশু কোলে করিয়া বংশীবাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। বলিলেন, চলুন, ওঘরে আপনি বসবেন। ওরে কানাইয়া, তুই বাবুর কাছে একটু ব'স।

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলাম। যাহার স্বামী মর-মর, তাহার প্রসাধনের এই পারিপাট্য! কপালে খয়েরের টিপটি পর্য্যন্ত পরিতে ভুল হয় নাই। ডুরে শাড়িটি দিব্য কায়দা করিয়া পরিয়াছেন। তা ছাড়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কানাইয়াকে বসাইয়া তিনি আসিলেন আমার সঙ্গে গল্প করিতে!

বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তার চেয়ে চলুন না, বংশীবাবুর ঘরে ব'সেই গল্প করা যাক।

সর্ব্বনাশ! মা এসে যদি দেখেন যে, আমি ওঁর কাছে ব'সে আছি, তা হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। যে কবরেজ এই সব ছাগল পুষতে পরামর্শ দিয়েছে, সেই ব'লে গেছে যে, এসব রোগে স্ত্রীর সাহচর্য্যও বিষবৎ। মরবার সময় স্বামীর যে একটু সেবা করব, তাও দেবেন না আপনারা? তাঁহার চোখ দুইটা যেন হিংস্র ক্ষোভে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর নিজের মনেই বলিয়া ফেলিলেন, আমার আবার স্বামী-সেবা! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কি জানেন?—গঙ্গায় ঝাঁপ দিই।

কেন?

কেন নয়? আমার কতদিন বিয়ে হয়েছে জানেন? মাত্র চার বছর। আমার বাবা সব জেনেশুনে ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। সবই অদৃষ্ট। না না, দ্বিতীয় পক্ষ নয়—প্রথম পক্ষই। উনি আজীবন কৌমার্য্য

রক্ষা করবেন ঠিক ক'রে জীবনের পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন রোগে ধরল, তখন মায়ের অনুরোধে প'ড়ে বিবাহ করলেন আমাকে—বংশরক্ষার জন্যে। এই দেখুন বংশধর।—বলিয়া সেই চামচিকার মত শিশুটাকে তুলিয়া ধরিলেন। ছেলেটা আচমকা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল। আমি কি আর বলিব! চুপ করিয়া রহিলাম। মনে হইল, পিঠের দিকে যেন কিসে একটা ঠেলা দিতেছে! ফিরিয়া দেখি, একটা লোমশ ছাগল।

বংশীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, আমার এখন একমাত্র কাজ হয়েছে—ওই দুর্গন্ধ ছাগলগুলো চরানো আর এই বংশধরকে পালন করা।

সদর-দরজায় শব্দ শোনা গেল।

শুদ্ধ পট্টবস্ত্রপরিহিতা বৃদ্ধা নারী পুত্রের কল্যাণে শিবপূজা করিয়া ফিরিতেছেন।

দুই দিন পরে।

বাড়ি ফিরিতেই ভজুয়া এক চিঠি দিল।

আলো জ্বালিয়া দেখি, একি কাণ্ড! এ যে এক প্রেমপত্র! কোন্ এক কমলা তাহার প্রাণেশ্বরকে লিখিতেছে! খামটা উল্টাইয়া দেখিলাম—আমারই তো নাম লেখা। ডাক্তার না লিখিয়া 'শ্রীযুক্ত' লিখিয়াছে।

এ কি রকম হইল? আমার চিঠি তো নয়। কার এ? পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। বিশ্রী হাতের লেখা,

বানান-ভুলে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ইঙ্গিতও আছে, কিন্তু তবু চিঠিখানি পড়িয়া ভারি ভাল লাগিল। কত সরলতা, কত আবেগ, কত আগ্রহ চিঠিখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! সংসারের কত খুঁটিনাটি সংবাদ, কত তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কত উদ্বেগ!

চিঠিখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করিতেছি, এমন সময় ভজুয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, দেখা করিতে চাহেন।

চিঠিখানি রাখিয়া বাহিরে গেলাম। অচেনা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন যে, পাট খরিদ করিতে তিনি অদ্য এ স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার নামে একটি চিঠি আসিবার কথা ছিল। ডাকঘরে খোঁজ করিয়াছিলেন, পিওন বলিয়াছে যে, আমাদের উভয়ের নাম এক হওয়াতে, ইত্যাদি।

হ্যাঁ, চিঠি আছে আপনার। ভুল ক'রে খুলে ফেলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

পত্র লইয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনে তরঙ্গ তুলিয়া গেলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইতে গেলাম। ঘুম আসিল না। সে কি সত্যই কোন দিন আসিবে না? সম্ভাবনা তো নাই। যাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা অসম্ভব, তাহাই মানুষ চায়, তাহা লইয়াই মানুষ স্বপ্ন-রচনা করে। সেদিন সকালবেলা এই লইয়া কত বক্তৃতাই না করিলাম! সত্যই তো।

কত রাত্রি হইয়াছে জানি না।

জানালা দিয়া লুব্ধক-নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। কি উজ্জ্বল!

একবার যদি কলিকাতা যাই, সে কি আমার সঙ্গে দেখা করিবে?

না করিবার কারণ তো নাই।

কবে তুমি দেখা দেবে—থেমে যাবে কথা মোর
নীরব হইয়া বাহু-বন্ধে,
তোমারে পাই না কাছে, তাই তো বাসনা ঘোর
কবিতায় কেঁদে মরে ছন্দে।
শরতে বা বরষায়, প্রভাতে বা সন্ধ্যায়
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যে অলকনন্দায়,
তারি কলকল্লোল
ছন্দের তোলে রোল,
—সাগর চুমিতে চাহে চন্দ্রে।
সাগরের মন্ত্র কি শুনেছ কখনো প্রিয়া,
নির্জ্জন সৈকতে একান্ত মন দিয়া?
দেখেছ কি প্রান্তরে,
পবন অশান্তরে,
উন্মাদ বনানীর গন্ধে?

নাঃ, লিখিতেও ভাল লাগে না। কথার পর কথা গাঁথা! কথায় কখনও উদ্বেলিত অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করা

যায়? এ যেন ক্ষুদ্র চামচে সমুদ্রকে ধরিয়া দেখাইবার চেষ্টা। প্রকৃতির মত যদি ভাষা পাইতাম! প্রভাতের সুরঞ্জিত আকাশ বর্ষার ঘনঘোর মেঘে বিদ্যুতের শিহরণ, ঢলঢল পুষ্পের সুবাসিত পেলবতা—কথাহীন, অথচ কি ভাষাময়! কত স্পষ্ট, কত স্বচ্ছ, কত প্রাণময়!

ডাক্তারবাবু!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম, বংশীবাবুর চাকর কানাইয়া।

কি রে?

জলদি চলিয়ে। বাবুকা হালৎ বড়া খারাপ।

বংশীবাবু তো মারা গেলেন। আর এক বিপদ।—বংশীবাবুর স্ত্রী সত্যসত্যই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন।

ধর—ধর—ধর।

পাড়ার দুইজন উৎসাহী ছোকরা লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া ফেলিল। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, একি! আমি তা হ'লে মরি নি? কেন আমাকে তুললেন আপনারা? আমার জীবনে কি আছে, যার জন্যে আমি বাঁচব? দরিদ্র স্বামীর চিকিৎসায় সর্ব্বস্ব গেছে, স্বামী গেছে, বাপ-মা বেঁচে

নেই; দিনকতক পরে না খেয়ে আমার ছেলেটা আমার চোখের সামনে মারা যাবে। দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরবার জন্যে বাঁচালেন আমাকে আপনারা? কেন তুললেন বলুন, কেন তুললেন?

বলিবার কিছুই নাই। তাঁহাকে তুলিয়া এবং বাঁচাইয়া সত্যই যেন নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল।

১০

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। ডাক্তারী জীবনের নিত্য ঘটনার তালিকা আর নাই লিখিলাম। হাতে দুইটা টাইফয়েড-রোগী আছে—নিঃসহায়ের মত তাহাদের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছি। রোগ আপনি বাড়ে, আপনি কমে, আমি মাত্র দুইবার করিয়া তাহাদের বাড়ি গিয়া প্রত্যহ কিছু টাকা লইয়া আসি।

ও-পাড়ার হারাণদার স্ত্রীর যক্ষ্মা হইয়াছে। বেচারীর বাঁচিবার জন্য কি আগ্রহ! অথচ বাঁচিবে না। তাহাকে রোজ সান্ত্বনা দিয়া আসিতে হয়, ভাল হয়ে যাবেন বইকি।

হারাণদা কন্ট্রাসেপ্‌শন করিতেছেন।

ঘোষাল-পাড়ার কালাজ্বর-রোগীটা বেশ ভাল হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার পেট-খারাপ হইয়াছে। চিন্তায় আছি।

ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ—মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই। অথচ মজ্জমান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্ব্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি—ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!

রসুলপুরের রাণীজী ভাল আছেন। তিনি আমাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। কুঞ্জলাল আমাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। রাণীজীর জমিদারিতে আমার প্র্যাক্‌টিস একচেটিয়া।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

আসিল, রংবাজারের আসমানী। একি! চেহারা এত খারাপ কেন? খুকখুক করিয়া কাসিতেছে আসিয়া বসিয়া

কি হ'ল তোমার আবার?

আজ মাসখানেক থেকে জ্বরে ভুগছি। কেউ কাছে নেই

যে, একটা খবর পাঠিয়ে জানাই আপনাকে। তা ছাড়া রোজ রোজ যে নিয়ে যাব আপনাকে, সে পয়সা কোথায় পাব ডাক্তারবাবু? মরতে মরতে তাই নিজেই এলাম।

আসমানী হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার গলা, বুক, নাড়ী যথারীতি পরীক্ষা করিলাম। জ্বর আছে।

রক্ত উঠেছিল মুখ দিয়ে?

হ্যাঁ, আজ চার-পাঁচ দিন থেকে একটু একটু উঠেছে কাসির সঙ্গে। কাসতে কাসতে গলাটা চিরে গেছে বোধ হয়।

রাত্রে কি ঘাম হয়?

হ্যাঁ, বিছানা বালিশ একেবারে ভিজে যায়।

বুঝিলাম, করাল রোগে ধরিয়াছে। যক্ষ্মা—আসমানীর জীবন-নাট্যলীলা শেষ হইবার আর বেশি দেরি নাই।

ঔষধ লিখিয়া দিলাম। সে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে আসব?

তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি যখন ওদিকে যাব, দেখে আসব তোমায়। ফী দিতে হবে না। কোন্‌খানটায় থাক তুমি?

রংবাজারে সেই যে শিবমন্দিরটা আছে, তার সামনের গলিতে আমার বাসা।—বলিয়া সে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আসিলেন হরিশবাবু। তাঁহার স্ত্রীর 'কলিক' আমার

চিকিৎসায় সারিয়াছে। সুতরাং আমি ভাল লোক এবং সেই জন্যই বোধ হয় খগেন ডাক্তারের নিন্দা আমাকে প্রত্যহ শুনিতে হইত, যদি না সেদিন হঠাৎ তাহা থামাইয়া দিতাম।

বলিয়াছিলাম, দেখুন, হরিশবাবু, ব'সে ব'সে কারও নিন্দে-টিন্দে করবার স্থান এ নয়। আপনাদের ক্লাব রয়েছে, 'বান্ধব-সমাজ' রয়েছে কি করতে তা হ'লে?

হতবুদ্ধি হরিশবাবু বলিলেন, নিন্দে মানে? খগেন ডাক্তারের মত অমন 'কাট্‌থ্রোট' দুটি আছে নাকি? এ তো তার মুখের ওপর বলতে পারি আমি। আমি কারু কিছু ইয়ে করি নাকি!

যাই হোক, ওসব আলোচনা আমার এখানে হয়, এটা আমি পছন্দ করি না।

আচ্ছা, বেশ তো।

সেই হইতে হরিশবাবু ও-কথা আর বলেন না।

হরিশবাবু আসিলেন।

হরিশবাবু পুত্রশোক ভুলিয়াছেন।

আসিয়াই বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, 'ওকাসা' জিনিসটা কেমন? কখনও ব্যবহার করেছেন?

না, আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি এ বয়সে ওসব উত্তেজক ওষুধ আর নাই ব্যবহার করলেন!

না না, আমার জন্যে নয়। আমার এক ফ্রেণ্ডের জন্যে।

হরিশবাবুর রসনা যাহাই বলুক, তাঁহার মুখচোখ আসল কথা ফাঁস করিয়া দিল। দুর্ব্বল মানুষ! আমিও তো দুর্ব্বল।

নয়ন মল্লিকের বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন ভোর।

নয়ন মল্লিককে মনে আছে, সেই যাঁহার বাড়িতে মহিন্দরের সঙ্গে দেখা হয়? মল্লিক মহাশয়, দেখিলাম, একটি ভাঙা মোড়ার উপর বসিয়া দাঁতন করিতেছেন।

আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু। ওরে, একটা মোড়া দে।

বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, অসুখ কার?

অসুখ হচ্ছে গিয়ে আমার স্ত্রীর এক গ্রাম-সম্পর্কের দাদা আছেন, তাঁর। তিনি এখানে আসেন প্রায় মাঝে মাঝে। এবার এসে জ্বরে প'ড়ে গেছেন।

মহিন্দরবাবু কোথা?

কি জানি! সে যে কখন কোন্ চুলোয় থাকে, সেই জানে। —বলিয়া খড়ম চটচট করিতে করিতে মল্লিক মহাশয় ভিতরে গেলেন। মল্লিক মহাশয়ের তিন কুলে কেহ নাই, এক পরিবার ছাড়া। শুনিয়াছি, লক্ষপতি লোক। অথচ ঘরদ্বার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহা বোঝা শক্ত। মহিন্দরের কথা মনে পড়িল।

মল্লিক মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চলুন তবে। শ্যামলালকে দেখেই নিন আগে। তারপরে চা-টা হবে এখন, কি বলেন?

হ্যাঁ, সেই ভাল।

শ্যামলালকে দেখিলাম। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক। জ্বর একটু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কিছু নয়। অর্থাৎ এমন কিছু নয়, যাহার জন্য দূর হইতে পঁচিশ টাকা ফী খরচ করিয়া ডাক্তার আনা প্রয়োজন। সাধারণ ম্যালেরিয়া বলিয়াই বোধ হইল। অথচ ইহার জন্য কৃপণ মল্লিক সহসা কেন এতগুলা টাকা ব্যয় করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিসফিস করিয়া মল্লিক-পত্নী মল্লিককে বলিলেন, তুমি আহ্নিকটা সেরে নাও না। ডাক্তারবাবু শ্যামদাদাকে ততক্ষণ দেখুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যাই। ত্রস্ত মল্লিক আহ্নিক করিতে গেলেন।

ব্যাপারটা ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। দেখিলাম, শ্যামদাদার জন্য মল্লিক-পত্নীর উৎকণ্ঠার অবধি নাই। নানারূপ প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বেদানা কতখানি করিয়া রোজ খাওয়ানো প্রয়োজন, শহর হইতে দামী পেটেণ্ট ঔষধ কি কি আনাইতে হইবে, শরীরটা সারিয়া গেলে ইহার পক্ষে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিবার উপযোগী স্থান মসুরি, শিলং, না পুরী, এই সব নানা কথা। শেষটা তিনি প্রসঙ্গত বলিলেন, উনি টাকা না দেন, আমি দোব। আপনি যা যা ব্যবস্থা করা

দরকার মনে করেন, সমস্ত খোলাখুলি একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান। হ্যাঁ, আর শ্যামদাদাকে ব'লে যান তো আপনি ভাল ক'রে যে, দুধ খাওয়াটা কত উপকারী এই রোগা শরীরে; কিছুতে উনি দুধ খাবেন না।

দুধ খাইতে বলিতে আর আপত্তি কি? বলিলাম।

দেখিলাম, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে, স্মিত মুখে শ্যামলাল নিরানব্বই ডিগ্রী জ্বর লইয়া শুইয়া আছেন, মল্লিক-পত্নী আন্তরিকতার সহিত তাঁহার মাথায় হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসলা মল্লিক-পত্নী।

আহ্নিক সারিয়া মল্লিক মহাশয় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। চলুন ডাক্তারবাবু, বাইরে গিয়ে বসা যাক।

বাহিরে বসিয়া চা পান করিতেছি। মল্লিক মহাশয়ের বাড়ির চা যে কি বস্তু, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, চায়ের সহিত তাহার যাহা সাধারণ মিল আছে তাহা এই যে, তাহা গরম।

মল্লিক মহাশয়ও দেখিলাম, প্রাতঃকালীন জলযোগ করিতেছেন—কিছু ছোলাভিজা ও মিছরি। মিছরি খাওয়ার পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র। না চিবাইয়া—চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, জিবকে ঠকাচ্ছি ডাক্তার-বাবু। তাহার পর মল্লিক কাজের কথা পাড়িলেন, কেমন দেখলেন?

ভয়ের কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবেন।

আচ্ছা, বেদানাটা কি খুব বেশি খাওয়া ভাল জ্বরের ওপর ?

দিতে পারেন। আপত্তি কি ?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

আবার বলিলেন, এবারে কিন্তু ফী-টা কিছু মাপ করতে হবে আমায়। দরিদ্র মানুষ আমি। আপনাদের যথাযোগ্য দর্শনী কি দিতে পারি ?

বলিলাম, তা হ'লে আমাদের চলে কি ক'রে বলুন ?

আচ্ছা, কিছু কম ক'রে নিন।

এই পৃথিবীতে ভাগ্যিস শ্যামলালদাদারা আছেন, তবু আমরা করিয়া খাইতেছি।

ফী কিছু কমই লইতে হইল।

মল্লিক মহাশয় নাছোড়।

১১

আরও পনরো দিন কাটিয়াছে।

দিনের বেলা কাজ ছিল না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে যেন আসিয়াছে। বাগানে নির্জ্জন জ্যোৎস্নায় যেন তাহার সহিত মুখামুখি বসিয়া আছি।

সেই কতকাল আগে—তোমার একটা কবিতায় চিঠি পেয়েছিলাম। আর তো চিঠি লেখ না। ভুলে গেলে আমায়?

না, ভুলি নি। তবে—

তবে কি?

ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তুমি এর আগে এমন ক'রে ভালবেসেছ কাউকে?

হ্যাঁ, নার্স ব্রাউনকে।

আর?

অত মনে নেই। তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি।

আর কবিতা লেখ না আজকাল?

বল তো মুখে মুখে বানাই একটা।

বানাও তো।

স্বপ্নের ঘোরে কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। বেশ মনে আছে, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া চলিয়াছি—

ভুলব কবে কাহার কথা কি ভাবে,
নিজেই আমি জানি না তার খবর;
কোন্ শিখাটি মন যে কবে নিবাবে,
কখন খোঁড়া হবে যে কার কবর—
কেমন ক'রে বলব বল সখী,
নিজের কাছে নিজেই আমি ঠকি।
তোমার চোখে অশ্রুধারা,—ওকি!
হঠাৎ দেখি বিপদ হ'ল জবর।

কাল কি হবে ভাবছ কেন সেসব ?
আজকে তুমি মনিব, আমি নফর।
সখী, আমার সারা হৃদয় জুড়ে যে
আজকে তুমি পেতেছ এই আসন,
জান সেথায় কত আগুন পুড়েছে ?
কতদিনের কত স্মৃতি-নাশন ?
আগুন কত জ্বলে এবং নেবে,
সেসব কথা লাভ কি বল ভেবে ?
অশ্রু মুছে এক্ষুনি তো দেবে
চুম্বনেতে উচ্ছ্বসিত ভাষণ।
ইন্সিওরেন্স প্রেমের চলে কি ?
মানবে কি তা প্রিমিয়ামের শাসন ?

প্রথম মনে লাগল যবে আগুন
লকলকিয়ে রক্ত-রাঙা ঝলকে,
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব তার এখন রাখে বল কে ?
হঠাৎ জ্ব'লে হঠাৎ পুনরায়
দীপ্ত শিখা লুপ্ত হয়ে যায়,
তাহার পানে মন কি ফিরে চায়,
তোমায় দেখে গেলাম ভুলে পলকে ;
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব রাখে এখন তার বল কে ?

পুড়েই যদি যেতাম, হ'ত ভাল কি—
এক প্রেমের আলো এবং ধূমেতে ?
মদির হ'ত তা হ'লে এই আলো কি,
সুধায় ভরা তোমার মধু-চুমেতে ;
ক্ষণিক তরে সকল ভুলে থাকা,
অধরখানি অধর 'পরে রাখা,
শরমভরে সোহাগটিরে আঁকা,
স্বপন দেখে জড়িয়ে ধরা ঘুমেতে ?
পুড়েই যদি যেতাম হ'ত ভাল কি—
এক প্রেমের জ্বালা এবং ধূমেতে ?

পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো—
একই মন্ত্রে একই রকম বলিতে,
প্রতিমাটাই বদল হয় খালি তো।
একটি সুরে বাজল বাঁশী নানা,
সত্যি সখী নাইকো তব জানা ?
একই আগুন ফিরিয়ে দিয়ে হানা
বারে বারেই নানা প্রদীপ জ্বালি তো।
পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো।

আজকে সখী, আকাশ-ভরা জ্যোছনা,
হৃদয় মোর চলছে দ্রুত, গোন তো।

কাঁদছ কেন? সত্যি কথা বোঝ না?
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো।
চকমকিয়ে তুলছে দুটি দুল,
মন্দ বায়ে কাঁপছে দুটি চুল,
বলেছি যা ভুল—সেসব ভুল,
উতল প্রাণ তোমার পায়ে প্রণত।
কাঁদছ কেন? ঠাট্টা তুমি বোঝ না?
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো।

ডাক্তারবাবু!

ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। খক খক খক—বাহিরে কে কাসিতেছে। উঠিয়া কপাট খুলিলাম। দেখি, আসমানী দাঁড়াইয়া আছে। হাতে তাহার একটি পুঁটুলি।

একি আসমানী, হঠাৎ?

আপনি দু-তিন দিন যান নি, তাই একবার দেখাতে এলাম।

কেমন আছ? ভেতরে এস।

ভাল নেই, ডাক্তারবাবু। এবার আমার অসুখটা সারছে না কেন বলুন তো?

সেরে যাবে। দু-চার দিন সময় নেবে।

কমছেও না তো, বরং যেন বাড়ছে, কাল সারা রাত্তির আমার ঘুম হয় নি। সারা রাত ব'সে কেসেছি।

আবার সে খকখক করিয়া কাসিতে শুরু করিল।

একটু পরে সে আবার সসঙ্কোচে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলব।

কি কথা, বল।

আমার গয়নাপত্তর যা অল্পস্বল্প আছে, আপনার কাছে এনেছি। আপনি যদি দয়া ক'রে নিয়ে—

তোমার গয়নাপত্তর? আমি নোব কেন?

কতদিন আর বিনা-পয়সায় আপনাকে কষ্ট দোব! সেবার এক শিশি ওষুধ খেয়েই আমার সেরে গেল; এবারে সারছে না কিছুতে। আপনি বরং ভাল ক'রে দেখে একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন।

তাহার মনস্তত্ত্ব বুঝিলাম। সে ভাবিতেছে যে, বুঝি বিনা-পয়সায় দেখি বলিয়া তাহার ভাল চিকিৎসা করিতেছি না। ভিক্ষার চাউল আকাঁড়া তো হইবেই।

তাহাকে বলিলাম, তোমাকে ভাল ওষুধই তো দিচ্ছি। সেবারেও তো তুমি আমাকে কিছু দাও নি। খারাপ ওষুধ দিয়েছিলাম কি?

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া আসমানী কহিল, না। আমি তা ভাবি না। পাঁচীর মা বলছিল কিনা যে, বদ্যির কড়ি না দিলে ব্যামো সারে না। তাই আমি—

আচ্ছা, আগে ভাল হয়ে ওঠ, পরে দিও এখন। দেবার সময় ঢের পাবে।

তা হ'লে একটা ভাল দেখে ওষুধ লিখে দিন, যাতে চট ক'রে সেরে যাই। কতদিন ভুগব!

চোখের কোণে তাহার অশ্রু জমিয়া উঠিল। তাহার সে শ্রী নাই, গালের হাড় দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, বিবর্ণ রক্তহীন মুখে জীবনের ভাতি নিবিয়া আসিতেছে, কোটরগত চক্ষু দুইটিতে অস্বাভাবিক জ্যোতি। বসিয়া কাসিতেছে—খক খক খক। তাহাকে বলিলাম, আচ্ছা, এবারে একটা দামী ওষুধ লিখে দিলাম, খাও, ভাল হয়ে যাবে।

অনেক আশ্বাসবাণী দিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইলাম।

তৃণখণ্ডের আশ্বাস-বাণী!

১২

কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া ছিলাম জানি না। যতই দিন যাইতেছে, ততই নিজের অসারতা নিজের কাছে ধরা পড়িতেছে। ছদ্মবেশ খুলিয়া খসিয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের অহঙ্কার! কতটুকু আমাদের জ্ঞান? এ যেন সামান্য শঙ্কিত দীপশিখা জ্বালিয়া বিশ্বব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করিবার চেষ্টা! অনেকের প্রদীপে আবার শিখাও নাই, শুধুই প্রদীপটা লইয়া ঘুরিতেছে।

বিবেক? প্রচলিত আইনের মত সমাজের শৃঙ্খলা বজায়

রাখিবার শৃঙ্খল—ন্যায়-অন্যায়-সম্পর্ক-বিরহিত। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার তোয়াক্কা রাখে না। সময় ও সুবিধা-অনুযায়ী নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করে।

আমার বাহিরে যাইবার 'সুট', ও আমার বিবেক—প্রায় একই বস্তু। 'সুট' বহিরাবরণ মাত্র—আমার জীবন্ত ত্বকের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল তফাত।

হঠাৎ বাহিরে কলরব উঠিল।

কে যেন কাহাকে মারিয়াছে! মহা হৈ-চৈ।

ক্ষণপরে হরিশবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত। মাথা দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, কামিজটা ভিজিয়া গিয়াছে।

ব্যাপার কি?

ভজুয়া তাহার মাথায় লাঠি মারিয়াছে।

ভজুয়া? আমার চাকর ভজুয়া?

হঠাৎ? খোঁজ করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা এই—

হরিশবাবু নাকি ভজুয়ার স্ত্রীর প্রতি— বাকিটা আর নাই লিখিলাম। ভজুয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, মার ডালেঙ্গে—। অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছি।

সমাপ্তি কিন্তু এখানেই নয়।

হরিশবাবু আমারই দেওয়া ব্যাণ্ডেজ মাথায় বাঁধিয়া বন্ধুমহলে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, আমারই প্ররোচনায়

ভজুয়া তাঁহাকে মারিতে সাহস করিয়াছে। তা না হইলে ভজুয়ার সাধ্য কি— ইত্যাদি।

লোকটাকে চাবকাইয়া দিব ?

কিন্তু আমি অশিক্ষিত ভজুয়া নই। সে যাহা পারে, আমি তাহা পারি না। সুতরাং বোধ হয় মনে মনে হরিশবাবুকে ক্ষমাই করিলাম, এবং প্রত্যহ তাঁহার ফাটা মাথা জোড়া দিবার চেষ্টায় স্মিত মুখে ড্রেস করিয়া চলিতে লাগিলাম।

কে ?

হরিশবাবুর চাকর—রামধন।

হরিশবাবুর স্ত্রী, আমার জন্য একটু তরকারি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভদ্রমহিলা সত্যই আমাকে স্নেহ করেন।

অথচ স্বামী-স্ত্রী।

এক খানা চিঠি হাতে করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

নয়নবাবুর পত্র—নয়ন মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন, মহিন্দর জেলে গিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষও পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন ; শ্যামলাল সহকারী।

নয়নবাবু লিখিতেছেন, সংসারে আর সুখ নাই। মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে। আমার নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি কোন সৎকার্য্যে দান করিয়া যাইতে চাই। আমি একটা উইল করিতে চাই যে, আমার পত্নী—যেখানেই থাকুন—আমার সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ-খরচা পাইবেন। তাঁহাকে আমি ভালবাসিতাম। একটা ভুল করিয়াছেন সত্য। কিন্তু উদরের দায়ে যেন সে ভুলটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য না হন—এই আমার অভিপ্রায়। আমিও তো ভুল করিয়াছিলাম, এই বয়সে একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া। ভুলের কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইতে চাই। আমার বাকি টাকা ও সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য খরচ হউক—ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনাকে ট্রাস্টী করিতে চাই। আপনার মতামত ও পরামর্শ জানাইবেন।

ভাবিতেছি, মানুষের কতটুকু চিনি আমরা!

আচ্ছা, তাহাকেও কি আমি ঠিক চিনিয়াছি? সেই কি তাই, যাহা আমি ভাবি? সে তো আমার এত ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া অপরের বাগ্‌দত্তা হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে একছত্র চিঠিও লেখা দরকার মনে করে না। তবে কি—কিন্তু হায় মানুষের মন! সমস্ত যুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে—

মনে হয় যেন বাতায়নে আছ দাঁড়ায়ে একা,
ঘুমায় সকলে, শয়ন-ঘরের নিবেছে বাতি,
আঁধারের বুকে চাহিছ আমার বারেক দেখা,
আকাশ জুড়িয়া থমথম করে নিশীথ-রাতি।
মেঘের মতন উদাসী হৃদয় ভাসিয়া চলে,
মূর্ত্ত কামনা জ্বলিছে নিবিছে তারার দলে,
সহসা নয়ন ভরিয়া উঠিছে নয়নজলে,
ক্ষণিকের তরে চাহিছ আমার স্বপন-সাথী।
এ কি মিছে কথা? হয়তো বা তাই—ব'লো না তবু,
ভেঙো না সে ভুল—ভেঙো না, এ ভুল
অনেক দামী,
হোক মিছে কথা, কল্পনা হোক, ভেঙো না কভু,
ভেঙো না, ভেঙো না, ভুলেরই স্বপন দেখিব আমি
যদি কভু মোরে ধরা নাহি দাও সর্ব্বনাশী,
তোমারি স্মরণে বাজুক আমার বিরহ-বাঁশী,
ছলনা তোমার, চাহনি তোমার, তোমার হাসি
নানা সুরে মোরে আকুল করুক দিবস-যামী।

১৩

ডাক্তারের দিন কাটিতেছে।

রোগী বাঁচে, রোগী মরে, টাকা রোজগার করি। বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। আবার যেদিন 'কল' কম থাকে, সেদিনও

শান্তি পাই না। কি চাই? বুঝিতে পারি না। এইজন্যই বোধ হয় মানুষ শেষবয়সে ভগবানকে চায়, অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আকাঙ্ক্ষা করে, যাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং মোহ ফুরায় না, শিশুর চাঁদ পাওয়ার মত। আমি মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যদি কোন ছবি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, সে ছবি ভগবানের নয়, তাহার। অবর্ণনীয় সে চাহনি!

জীবনের গোনা দিনগুলি একে একে ফুরাইয়া যাইতেছে। এ জীবনে আর তাহাকে পাইলাম কই? পাই নাই? আমার সমস্ত প্রাণ মন পরিপূর্ণ করিয়া এই তো সে অহরহ বসিয়া আছে, তবু তাহাকে পাই নাই? তাহাকে বাহিরে চাই, বাহিরে পাইয়া হারাইতে চাই। আশ্চর্য্য!

সত্যই তো, জীবনের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, একদিন মরিয়া যাইব। তাহাকে পরজন্মে পাইব কি? পরজন্ম কি আছে? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, আছে। বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, এই জীবনের পরপারে আবার আমাদের মিলন হইবে। সেখানে সে কাহারও বাগ্‌দত্তা নয়। সেখানে সে কেবল আমার—আমারই।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

আসিলেন ঝাঁকড়া-ভুরু।

ডাক্তারবাবু, আপনি কি আসমানীর চিকিৎসা করছিলেন?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

চলুন একবার দয়া ক'রে, তার অবস্থা বড় খারাপ।

আসমানীকে আপনি চিনলেন কি ক'রে ?

সে আমার মেয়ে।

আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ, আমারই মেয়ে, বাড়ি থেকে এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেই থেকে খুঁজছি তাকে। সেইজন্যেই অসুখের মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে ছুটি নিচ্ছি। আমার অসুখ-টসুক সব মিছে কথা। আমার আসল অসুখ এই।

ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কার মুখে শুনেছিলাম, হতভাগী এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আজ তাকে পেয়েছি, কিন্তু এ কি অবস্থায় পেলাম! কি হয়েছে তার? তার মুখে শুনলাম, আপনি তার ওপর অনেক দয়া করেছেন। বলুন না ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে তার ? বাঁচবে তো ?

বলিতে পারিলাম না।

কেবল বলিলাম, চলুন, গিয়ে দেখি।

আসমানী মরিয়াছে।

সবাই মরিবে। আমিও মরিব, হয়তো কালই। তাহার কথা কেবলই ভাবিতেছি। আসমানীর নয়, তাহার। আশ্চর্য্য

মানুষের মন! এ সময় সে আসিয়া মন জুড়িয়া বসিল। এই তো জীবন, আজ আছে কাল নাই।

আঁধার—আঁধার খালি, চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার,
তীব্র বেগে বহিতেছে বায়ু,
খুঁজি কারে হাতে ল'য়ে ক্ষুদ্র দীপ ত্রস্ত শিখা তার,
অতি অল্প অনিশ্চিত আয়ু।
অচিরাৎ বায়ুবেগে নিবে যাবে ক্ষুদ্র দীপশিখা,
অকস্মাৎ অন্ধকারে চূর্ণ হবে স্বপ্ন-অট্টালিকা,
স্রোতমুখে তৃণখণ্ড। বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা,
দুঃখে সুখে কাঁপে তার স্নায়ু।
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
ল'য়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ু।